পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা দ্রুতপঠন

সম্পাদনা

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
রবীন্দ্র অধ্যাপক, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা
প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৮৭

প্রকাশক
সুধীর কুমার মণ্ডল
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
ক্যালকাটা অফ্‌সেট প্রেস, কলিকাতা-৬৭

আর্টওয়ার্ক—বরুন সাহা

মূল্যঃ ৮.৯০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বাঘের কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা প্রসঙ্গে

'বাঘের কথা' রচনাংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সে' গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের পালিত কন্যা নন্দিনী ওরফে পুপুকে কবি সরস ভাষায় যে গল্প বলতেন তা-ই 'সে' গ্রন্থে বর্ণিত। এখানে একটি বাঘের কথা আলোচনা করা হয়েছে। কবির রচনার গুনে বাঘের স্বভাবের বর্ণনা খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে।

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যখন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল; আমি বললুম, নপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।

পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অন্যায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল আছে। কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই না।

শুনেই ফস্ করে পুপের মাথায় বুদ্ধি এল; বলে ফেলল, জান দাদামশায়? বাঘরা কখ্খনো নাপিতকে খায় না।

আমি বলুলম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান, বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পূর্ব পারে থাকে?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে!

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধরীতি! ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেন্না। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্‌তা লাগায়।

তা লাগালেই বা?

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেন্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে করে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবালে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাড়ি গোঁফ, তার দুই গাল, লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে সেখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি বলে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় পড়ে মিথ্যে করে বললে, গণ্ডার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি। ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ

নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়—নিশ্চয়ই মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত!

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো খরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে।

কিরকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনাতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শ্রাদ্ধ নাই-বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী করে।

সেই তো আরো বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো কিন্তু মরে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচ্‌কিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিদ্যা-বচস্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্যার আড়াই পহর রাত পর্যন্ত ওকে কেবল খ্যাক্‌শিয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিম্বা মাসতুতো শ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না—আর ওকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বল কী, খ্যাঁকশিয়ালির মাংস! যতদূর অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাঁকশিয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হল?

হল বৈকি।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র পড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম-মন্ত্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনামন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন।

ওরা বলে, মানুষের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুশ্রী। তার পরে, সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো না ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে—দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দৌল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীব সৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক্ কয়েক-টুক্‌রো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতোপরে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে—আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড় জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার।

ভয়ংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত করে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। পুপু কে? সাহেবের মাংস খেলে বাঘের কি করতে হবে। কেন করতে হবে? [২+৪+৪]

২। "রক্ত মনে করে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে।" কি জিনিসকে রক্ত মনে করল? কে মনে করল? কোথায় ঐ জিনিসটি ছিল? মুখ ডোবানোতে কী হল? [২+২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "কামড় বিশারদ-মশাই হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।" কিসের প্রায়শ্চিত্ত? কি খাওয়ার হুকুম হল? কারা শিকার করবে? একথা শুনে বাঘ কি করল? [২+২+২+৪]

২। "ওরা বলে .... কী কুশ্রী"। কে এবং কেন কুশ্রী? ওরা কিভাবে হাঁটে? ওরা কারা? শর্দ্বোল্যতত্ত্বরন্তের এ বিষয়ে মত কী? [২+২+২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পুপুদিদির মনটা সার্কাস দেখে আবার কি হল? সে নাপিতের খবর নিচ্ছিল কেন? [১+২]

২। চৌরঙ্গীতে কাদের দোকানে বাঘকে নেবে? কেন নেবে? [২+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

সন্ধিবিচ্ছেদ কর—কপটাচরণ, দুর্গ্রহ। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ: বিশ্বাস, অন্যায়, পাপ, পশ্চিম।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কথা

কাহিনী প্রসঙ্গে

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত 'মহাভারতের কথা' থেকে গল্পটি উদ্‌ধৃত। মহাভারতের নির্বাচিত অংশগুলি লেখক কিশোর কিশোরীদের জন্য সহজ ভাষায় লিখেছেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী মহাকবি কালিদাসও প্রায় দুহাজার বছর আগে লিখে গেছেন। তোমরা তা বড় হয়ে পড়বে।

এমন মায়ের কথা কি কেহ শুনিয়াছ যে, সে তাহার কচি খুকিটিকে নদীর ধারে ফেলিয়া, নিষ্ঠুর ভাবে চলিয়া যায়? মেনকা নামে এক অপ্সরা ঠিক এমনি নিষ্ঠুর ছিল।

তাহার একটি খুকি হইল, আর সে তাহাকে

মালিনী নদীর ধারে ফেলিয়া, পাষাণীর মতন চলিয়া গেল!

আহা! মা হইয়া কি এমন নিষ্ঠুর কাজ করে? খুকিটির মুখখানি এতই সুন্দর ছিল যে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বনের পাখিরাও তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা বনের পাখি; মানুষের ছানাকে কি খাওয়াইতে হয়, তাহা তাহারা জানে না! তাহারা খালি খুকিটির চারি ধরে বসিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল, আর ডানা দিয়া তাহাকে সূর্যের তাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিল।

এমন সময় মহামুনি কণ্ব সেই নদীতে স্নান করিতে আসিলেন। ধার্মিক তপস্বীরা পশুপক্ষীকে পর্যন্ত কত দয়া করেন, এমন খুকিটিকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ স্নেহে গলিয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য কি? তিনি তাহাকে বুকে করিয়া পরম যত্নে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিলেন। নিজের সন্তান ছিল না, সেই খুকিটিকে তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত স্নেহ দিয়া, মনে ভাবিলেন, যেন সেই তাঁহার সন্তান।

পাখিরা তাহাকে পালন করিয়াছিল, এইজন্য কণ্ব সেই কন্যাটির নাম রাখিলেন, শকুন্তলা (শকুন্ত=পক্ষী)। শকুন্তলা যখন কথা কহিতে শিখিল তখন কণ্বকে সে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সে জানিত যে, মুনিই তাহার পিতা।

সেই মেয়েটিকে পাইয়া না জানি মুনির প্রাণে কতই আরাম বোধ হইয়াছিল। তাহার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাইলেই তাঁহার আনন্দ উথলিয়া উঠিত। মেয়েটির এমন বুদ্ধি যে, তাহাকে কিছুই বলিয়া দিতে হইত না। সে তাহার দুটি খুরখুরে পায় ছুটাছুটি করিয়া; আর তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি নাড়িয়া মুনির ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে ফুল তুলিয়া আনা অবধি, এত কাজ করিয়া রাখিত যে, তাহা যে দেখিত, সেই আশ্চর্য হইয়া যাইত।

বনের যত হরিণ, আর পাখি, তাহারা ছিল শকুন্তলার খেলার সঙ্গী। তাহারা তাহাকে দেখিলেই ছুটিয়া আসিত। শকুন্তলা তাহাদিগকে খাবার দিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিত, তাহারাও শকুন্তলার আঁচলে মাথা গুজিয়া খেলা করিত।

এইরূপে বনের পশুপক্ষীর সঙ্গে খেলা করিয়া, আর কণ্বের নিকট ভগবানের কথা শুনিয়া, শকুন্তলা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। মুনি ঋষি ছাড়া বাহিরের মানুষ তপোবনে প্রায় আসিত না। কাজেই শকুন্তলা তাহাদের কথা বেশি করিয়া জানিতেও পারিল না। তাহার জন্ম এবং শিশুকালের কথা কণ্ব অন্যান্য মুনিদিগকে অনেক সময় বলিতেন, সুতরাং সে-সকল কথা সে মোটামুটি জানিয়াছিল।

ইহার মধ্যে একদিন সেই বনের ধারে হস্তিনার রাজ্য দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার লোকজনের অন্ত ছিল না। তাহাদের কোলাহল শুনিয়াই বনের জন্তুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। শুয়োর হরিণ যত ছিল, রাজা তাহার অনেকগুলিই মারিয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে যে মারেন নাই, তাহা কেবল তাঁহার ভয়ানক পিপাসা হইয়াছিল বলিয়া।

পিপাসায় অস্থির হইয়া, রাজা জল খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে কণ্বমুনির আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি সুন্দর আশ্রমটি। গাছের ছায়ায়, ফুলের গন্ধ আর পাখির গানে সেখানে গেলেই প্রাণ শীতল হইয়া যায়। মালিনী নদী তাহার নীচ দিয়াই কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এমন সুন্দর নদী, এমন নির্মল জল, আর কোথাও নাই। জলের পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে নদীতে সাঁতার দিতেছে, তাহাদের কলরব যেন সেতারের বাদ্য, এমনি মিষ্ট।

আশ্রমের নিকট আসিয়া আর তাহার শোভা দেখিয়া সকলের মনেই ভক্তির উদয় হইল, সৈন্যরা তাহাদের ধুলামাখা বিকট চেহারা লইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। রাজা তাঁহার রাজ বেশ ছাড়িয়া বিনয়ের সহিত সাধারণ লোকের

মত, কেবল অমাত্য আর পুরোহিত সঙ্গে লইয়া মুনির সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন।

আশ্রমের ভিতরে মুনিগণ কেহ বা বেদগান করিতেছেন, কেহ বা ধর্মের কথা বলিতেছেন, কেহ বা ভগবানের চিন্তা করিতেছেন। রাজা যত দেখেন, ততই বলেন, "আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর!"

আশ্রমের যেখানে কণ্ব থাকেন, তাহার নিকট আসিয়া রাজা পুরোহিত আর অমাত্যকেও বলিলেন, "আপনারা এইখানেই থাকুন, আর ভিতরে গিয়া কাজ নাই।" তারপর রাজা একাকী ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কণ্বকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বলিলেন, "কুটিরের ভিতরে কেহ আছ কি? যদি থাক বাহিরে আইস!"

কুটিরের ভিতর আর কে থাকিবে? শকুন্তলাই সেখানে ছিলেন। রাজা হয়ত ভাবিয়াছিলেন মুনির কোন শিষ্য কুটির হইতে বাহির হইবে, কিন্তু উহার ভিতর হইতে যে এমন সুন্দর দেবতা বাহির হইয়া আসিবেন, এ কথা তিনি মনে করিতে পারেন নাই।

শকুন্তলা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বাড়িতে অতিথি উপস্থিত। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলেন, সুতরাং ইহাও তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, অতিথি সাধারণ লোক নহেন, নিশ্চয় কোন রাজা। মুনি বাড়িতে নাই, সুতরাং অতিথির আদর শকুন্তলাকেই করিতে হইল।

তাই তিনি রাজাকে বসিবার আসন আর পা ধুইবার জল দিয়া অতিশয় মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখানে কিজন্য আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কাজ করিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, আমি মহর্ষি কণ্বের পায়ের ধুলা লইতে আসিয়াছি। তিনি কোথায়?"

শকুন্তলা বলিলেন, "তিনি ফল আনিতে গিয়াছেন একটু পরে আসিবেন আপনি বসুন।"

রাজা শকুন্তলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া, আর বুদ্ধি আর ভদ্রতা দেখিয়া, তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। সুতরাং তিনি আর তাঁহার পরিচয় না লইয়া থাকিতে পারিলেন না।

রাজা শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এই বনের ভিতরে কি জন্য বাস করিতেছ? আর কি করিয়াই বা এমন সুন্দর হইলে?"

শকুন্তলার বলিলেন, "আমি মহর্ষি কণ্বকেই আমার পিতা বলিয়া থাকি। কিন্তু শুনিয়াছি আমার পিতার নাম বিশ্বামিত্র, আর মার নাম মেনকা। মহর্ষি কণ্ব আমাকে মালিনী নদীর ধারে কুড়াইয়া পাইয়া, কৃপা পূর্বক নিজের কন্যার মতন আমাকে পালন করিয়াছেন। আমার নাম শকুন্তলা।"

শকুন্তলা কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "শকুন্তলা, আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি।
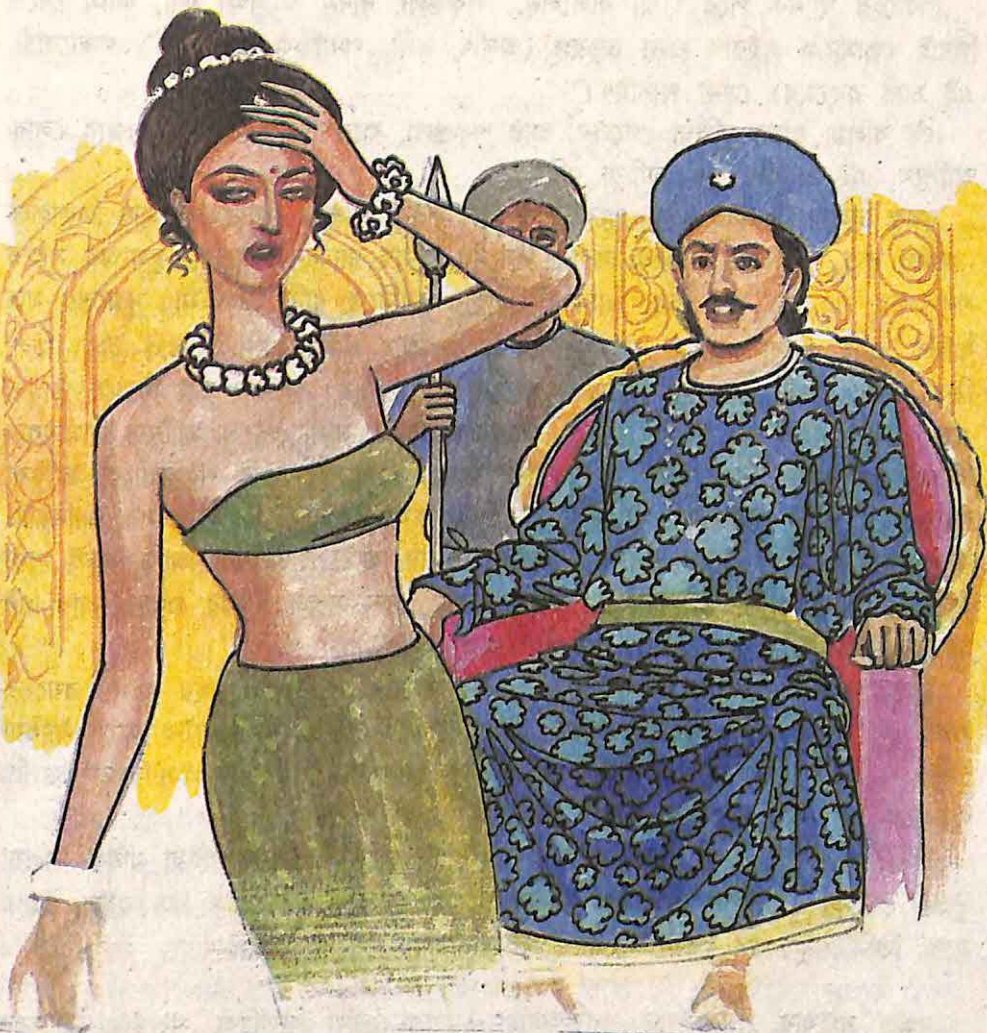
আমি তোমাকে সোনালি শাড়ি, গজমতির মালা, আর নানান্ দেশের মহামূল্য মণি-মানিক আনিয়া দিব, আমার রাজ্যে যত ধন আছে, সকলই তোমার হইবে; তুমি আমার রানী হও।"

শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, আমিও তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আমি তোমার রানী হইব।"

এ কথায় রাজা পরম আনন্দের সহিত সুন্দর সুগন্ধি সাদা ফুলের মালা আনিয়া, একগাছি নিজে পরিলেন, আর একগাছি শকুন্তলাকে পরিতে দিলেন। তারপর রাজা নিজের গলার মালা লইয়া শকুন্তলার গলায় পরাইয়া দিলেন; শকুন্তলাও তাঁহার নিজের গলার মালাখানি লইয়া রাজার গলায় পরাইয়া দিলেন। এইরূপে গন্ধর্বদিগের মতন করিয়া তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের খানিক পরে রাজা বলিলেন, “শকুন্তলা, দুদিন অপেক্ষা কর, আমি দেশে গিয়াই তোমাকে লইবার জন্য চতুরঙ্গ (অর্থাৎ, রথী, পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী, এই চারি রকমের) সেনা পাঠাইব।”

এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন, আর শকুন্তলা, কবে তাঁহাকে নিতে রাজার লোক আসিবে, এই ভাবিয়া পথ চাহিয়া রহিলেন।

দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কণ্ব ফল লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। মুনি ত্রিকালজ্ঞ (অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সকল সময়ের কথাই জানেন), সুতরাং দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহের কথা বনে থাকিয়াই তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। দুষ্মন্তের মত ধার্মিক এবং গুণবান রাজা এই পৃথিবীর মধ্যে আর নাই; মুনির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, ঠিক এমনি একটি লোকের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হয়। সুতরাং এই বিবাহে তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, ঘরে ফিরিয়া ফলের বোঝাটি মাথা হইতে মাটিতে নামাইবার বিলম্বটুকুও তাঁহার সহ্য হইল না। বোঝা মাথায় করিয়াই, তিনি শকুন্তলাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওমা, শকুন্তলা! মা, কি আনন্দের কথাই হইয়াছে? আমি সব জানিয়াছি মা। দুষ্মন্তের মতন এমন মহাশয় লোক তোমার স্বামী হওয়াতে, আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। আমি আশীর্বাদ করি যে, তোমার পুত্র যেন সকল বীরের প্রধান, আর এই সসাগরা (অর্থাৎ সাগর সমেত) পৃথিবীর রাজা হয়।”

মুনি যেমন বর দিলেন, শকুন্তলার তেমনি মহাবীর পুত্র হইল। ছয় বৎসর বয়সের সময় সে সিংহ, বাঘ, শুয়োর, মহিষ, আর হাতিকে আশ্রমের নিকটের গাছে বাঁধিয়া চাবুক মারিত! তাহা দেখিয়া আশ্রমের মুনিরা তাহার নাম রাখিলেন, “সর্বদমন” অর্থাৎ সকলকে যে দমন (শাসন) করিতে পারে।

কিন্তু, আশ্চর্যের কথা আর কি বলিব? ‘দুদিন পরে তোমাকে লইয়া যাইব’ বলিয়া দুষ্মন্ত গেলেন; তারপর এই ছয় বৎসর চলিয়া গেল, খোকা এত বড় হইল, ইহার মধ্যে তিনি শকুন্তলার কোন সংবাদই লইলেন না।

দুষ্মন্ত যাইবার সময়, যত দূর অবধি তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, শকুন্তলা কুটিরের কোণে দাঁড়াইয়া ততদূর পর্যন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া ছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায়, আর সকল অবসর সময়ে, সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। প্রতিদিন তাঁহার মনে হয়, ‘আজ আমাকে নিতে আসিবে’, কিন্তু হায়, প্রতিদিনই তিনি, সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সেই পথে কাহাকেও আসিতে না দেখিয়া, ছল ছল চোখে ঘরে ফিরেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা ক্রমাগতই হয় যে, “হায়। কেন এমন হইল?” কিন্তু পাছে কেহ দুষ্মন্তের নিন্দা করে এ জন্য নিজের মনের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না।

আশ্রমের সকলেই হয়ত এ কথা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেন, আর হয়ত দুষ্মন্তের নিন্দাও করিতেন, কিন্তু কেন যে এমন হইয়াছিল—দুষ্মন্তের মত ধার্মিক রাজা কেন যে তাঁহার রানীকে এমন আশ্চর্য ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই জানিতেন। দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ার পরেই একদিন দুর্বাসা মুনি কণ্বের আশ্রমে আসেন। কণ্ব তখন ঘরে ছিলেন না, শকুন্তলা এক মনে দুষ্মন্তের কথা ভাবিতেছিলেন তাই তিনিও দুর্বাসাকে দেখিতে পান নাই। ইহাতেই মুনি অপমান বোধ করিয়া শকুন্তলাকে শাপ দেন, "যাহার কথা ভাবিয়া তুই আমাকে অমান্য করিলি সেই দুষ্মন্ত তোকে ভুলিয়া যাইবে।" এইজন্যই, হস্তিনায় গিয়া দুষ্মন্তের আর শকুন্তলার কথা মনে ছিল না।

শকুন্তলার ছেলেটি ছয় বৎসরের হইয়াছে, আর ইহারই মধ্যে সে এমন অসাধারণ বীর হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা দেখিয়া কণ্ব শকুন্তলাকে বলিলেন, "মা, সর্বদমনের এখন যুবরাজ হওয়ার সময় হইয়াছে, অতএব তোমার—আর এখানে থাকা উচিত নহে। তুমি শীঘ্র ইহাকে লইয়া হস্তিনায় চলিয়া যাও।"

এ কথায় শকুন্তলার মনে বড়ই আনন্দ হইল। আবার কেমন একটা ভয়ও হইল। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তপস্বীর মেয়ের জিনিসপত্র অতি সামান্যই থাকে, সুতরাং তাহাদের যাত্রার আয়োজনও খুব অল্পই করিতে হয়। কেবল একটি জিনিস ছিল, যাহাকে শকুন্তলা অন্য সকল দ্রব্যের চেয়ে ভালোবাসিতেন আর যত্নে রাখিতেন। সে জিনিসটি একটি আংটি! বিবাহের সময়ে এই আংটিটি দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দেন। সেই আংটিটি হাতে আছে কি না তাহাই শকুন্তলা সকলের আগে দেখিলেন ; তারপর আর অন্য কিছুর জন্য তাঁহার বেশি চিন্তা হইল না।

এইটুকু আয়োজনে আর অধিক সময় লাগিল না, তারপর কণ্বের দুইজন শিষ্যকে লইয়া, আর ছেলেটিকে কোলে করিয়া শকুন্তলা হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। কণ্বের নিকট বিদায় লইবার সময়, অবশ্য তাঁহার খুব কষ্ট হইল, কিন্তু দুষ্মন্তের আর ছেলেটির কথা ভাবিয়া তিনি তাহা সহিয়া রহিলেন। পথের কষ্টকে তিনি কষ্টই মনে করিলেন না। চলিতে চলিতে তিনি এত কথা ভাবিতেছিলেন যে পথে কি হইতেছিল, তাহার দিকে তিনি মনই দিতে পারেন নাই। কেবল খোকা খুব উৎসাহের সহিত কোন কথা বলিলে তাহাই তিনি একটু শুনিতে পাইয়া আনমনে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহারা দুষ্মন্তের সভায় উপস্থিত হইলে, কণ্বের শিষ্যগণ শকুন্তলাকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়, রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া আনন্দিত হওয়া বা আদর করা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না।

রাজার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন শকুন্তলাকে তিনি নিতান্ত অপরিচিত স্ত্রীলোক মনে করিয়াছেন, আর আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছেন, "এ কিসের জন্য এমন ভাবে আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল?" হায়! কি লজ্জা, কি কষ্ট! রাজা চিনিতে না পারায়, শকুন্তলা নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা আরো আশ্চর্য

হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা ? আমার ত তোমাকে কখনো দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না।"

তখন শকুন্তলার মনে হইল, যেন সেই ঘরখানি ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর কোথা হইতে অন্ধকার আসিয়া সকল জিনিস ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তারপর কি হইল, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

জ্ঞান হইলে শকুন্তালার সেই আংটির কথা মনে হইল; তিনি ভাবিলেন যে, আংটি দেখিলে হয়ত সকল কথা রাজার মনে হইবে। কিন্তু হায়! হাতের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা দেখিলেন, আংটি নাই। আসিবার সময় একটি নদীতে নামিয়া হাত মুখ ধুইয়াছিলেন, তখন আংটিটি জলে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন শকুন্তলা নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, "হায়! না জানি অন্য জন্মে আমি কি ভয়ানক পাপ করিয়াছিলাম, শিশুকালে মা আমাকে ফেলিয়া দিল; আবার এখন তুমি পতি হইয়াও আমাকে চিনিতে পারিলে না। আমার জন্য আমি ভাবি না, কারণ পিতার নিকট গেলেই আমি আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমাদের পুত্রটিকে তুমি আদর না করিয়া বড়ই অন্যায় করিতেছ।"

ইহার উত্তরে দুষ্মন্ত বলিলেন, "স্ত্রীলোকেরা বড় মিথ্যাবাদী, বোধহয় তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ, তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

এ কথা শুনিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি নিজেই এখান হইতে চলিয়া যাইব; আর কখনো তোমার সহিত কথা কহিব না। কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার পরে আমাদিগের এই পুত্রই এই পৃথিবীর রাজা হইবে।"

এমন সময় স্বর্গ হইতে দেবতাগণ অতি গভীর স্বরে দুষ্মন্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "দুষ্মন্ত! শকুন্তলা তোমার রানী, এই বালক তোমার পুত্র। তুমি শকুন্তলাকে অপমান করিও না। তাঁহাকে আর তোমার পুত্রকে আদর করিয়া ঘরে লও, আমাদের কথায় এই বালকের 'ভরত' নাম রাখ। তোমার পরে ইনি অতিশয় বিখ্যাত রাজা হইবেন।"

দেবতাদের কথা শুনিবামাত্র দুষ্মন্তের সকল কথা মনে পড়িল। সভার লোক যে কি আশ্চর্য হইল; তাহা কি বলিব। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তাহাদিগকে ইহার চেয়েও অধিক আশ্চর্য হইতে হইল।

দেবতাদের কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিতেছে, এমন সময় রাজার প্রহরীগণ এক জেলেকে বাঁধিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল, প্রহরীরা বলিল, "এই জেলে রাজার আংটি চুরি করিয়া বাজারে বেচিতে গিয়াছিল।"

জেলের কথা শুনিয়া সকলে বলিল, "তবে বল্ ব্যাটা, তুই সেই মাছ কোথায় পাইয়াছিলি।"

জেলে বলিল, "আমি শচী তীর্থের নিকটে জাল ফেলিয়া সেই মাছ ধরিয়া ছিলাম।"

আংটি যে রাজার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কেন না রাজার নাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে। যে উহা হাতে নেয়, সেই বলে, "তাই ত, এ যে মহারাজের আংটি, এ

আংটি মাছের পেটের ভিতরে কি করিয়া গেল?”

তাহাতে রাজা আংটিটি দেখিবার জন্য হাতে লইলেন। সে আংটির দিকে তাকাইবামাত্র তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন “এই আংটি আমি শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়াছিলাম।”

ইহার পর কাহারো আর কোন কথাই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন যে কিরূপ সুখ আর আনন্দের ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা কাগজে লেখার চেয়ে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে অনেক মিষ্ট লাগে।

শকুন্তলা যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, দুষ্মন্তের আদরে তাহার সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। সর্বদমন যুবরাজ হইলেন, আর তাঁহার ‘সর্বদমনের’ বদলে ‘ভরত’ নাম হইল। ইহার পরেও তিনি সিংহ আর বাঘ লইয়া খেলা করিতেন কি না তাহা আমি শুনিতে পাই নাই! কিন্তু তিনি যে রাজাদিগের সকলকেই পরাজয় করিয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে। আমাদের এই দেশের নাম যে ভারতবর্ষ, তাহা এই ভরত হইতেই হইয়াছে।

এই গল্পে যে দুর্বাসার শাপ এবং আংটির ঘটনার কথা আছে, তাহা মহাভারতে নাই। কালিদাসের শকুন্তলায় এই-সকল ঘটনা আছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শকুন্তলার মায়ের নাম কি? শকুন্তলাকে সূর্যের তাপ থেকে কারা বাঁচিয়েছিল? শকুন্তলা কাহাকে ডাকিত? কণ্ব মুনির আশ্রমটি কেমন ছিল বর্ণনা কর। [২+২+২+৪]

২। রাজা কেমন ভাবে মুনির সঙ্গে দেখা করলেন? কেন দেখা করতে গেলেন? মুনি তখন কোথায় ছিলেন? মুনি আশ্রমে ফিরিয়া শকুন্তলাকে কি বলিলেন? [২+২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। “বনের যত হরিণ.........খেলার সঙ্গী”।

বনে শকুন্তলার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে শকুন্তলার কী সম্পর্ক ছিল? তারা কারা? এ ছাড়া শকুন্তলা কি কাজ করত? [++]

২। “স্ত্রীলোকেরা বড় .... কে বিশ্বাস করিবে?

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একথা কেন বললেন? দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা কেন ভুলে গিয়েছিলেন? রাজার কোন জিনিস শকুন্তলা হারিয়েছিলেন? রাজার কথা শুনে শকুন্তলা কি উত্তর দিলেন? [২+২+২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

শকুন্তলার ছেলের নাম কি? শকুন্তলার পিতার নাম কি? সর্বদমন কথার মানে কি? [১+১+১]

২। শকুন্তলার আংটি কোথায় হারিয়েছিল? আংটিটি কে পেয়েছিল? কোথায় পেয়েছিল? [১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ—নিষ্ঠুর, আনন্দ, অন্ত, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, ধার্মিক।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

রচনা প্রসঙ্গে

'নিরঞ্জন' গল্পটি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্র থেকে গৃহীত। তিনি অনেক হাসির গল্প লিখেছেন, আবার পাশাপাশি গম্ভীর রচনাও করেছেন। উদ্‌ধৃত গল্পটিতে একজন সৎ ও বিবেকবান লোকের কথা বলা হয়েছে, যিনি স্বার্থপর ও নীচমনা লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

তনু রায়ের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনু রায়ের প্রতিবেশী। নিরঞ্জন বলেন, "রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে ঘোর পাপ হয়।"

তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘৃণা করেন। যে দিন তনু রায়ের কন্যার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেই দিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বলেন, "কন্যাবিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।"

নিরঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক! নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষার শেষ নাই, তাই রাত্রিদিন তিনি পুথি-পুস্তক লইয়া থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভালবাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইঁহার নাম হয় নাই। পূর্বে অনেকগুলি ছাত্র ইঁহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিয়া, ইনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আহার পরিচ্ছেদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ গিয়া বিদায়ের জন্য ইনি মারামারি করিতেন না। কারণ, ইঁহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈতৃক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

গ্রামের জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার একজন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে, "ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।"

পেয়াদা বলিল, "তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, ঠাঁই হইয়াছে ভাত প্রস্তুত, ভাত দুইটি মুখে দিয়া, চল, যাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে গৃহিণী আহার করিবেন না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবে।"

পেয়াদা বলিল, "তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এইক্ষণে যাইতে হইবে, বটে? আচ্ছা, তবে চল যাই।"

পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "কখন আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।"

জমিদার বলিলেন, "বামুনমারীর মাঠে আপনার যে পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চান্ন বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিলপত্র ভাল আছে, সে জন্য সবটুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যেটুকু অধিক হইয়াছে, সেটুকু আমার প্রাপ্য।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন "আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়, দলিলপত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি; এই কাগজখানি কি না?"

জনার্দন চৌধুরী কাগজখানি হাতে লইয়া বলিলেন, "হাঁ এই কাগজখানি বটে, ইহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজখানি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজখানি তামাক খাইবার আগুনের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে

কাগজখানি জ্বলিয়া উঠিল।

জমিদার বলিলেন, "হাঁ হাঁ, করেন কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কেবল পাঁচ বিঘা কেন? আজ হইতে আমার সমুদায় ব্রহ্মোত্তর আপনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।"

পাছে বহ্মশাপে পড়েন, সেজন্য জনার্দন চৌধুরীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন, "দলিল গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন "না মহাশয়! জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়বৈভবচিন্তায় যদি ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে, চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ দুই প্রহরের সময় আপনার যবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল? সুতরাং সে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশূন্য ব্যক্তির নিকট রাজা, ধনী, নির্ধন, সবাই সমান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও অপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা-মায়াজালের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-তাপিত তৃষিত মরুপ্রান্তর হইতে আপনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন কখনও কাহারও নিকট কোনও বিষয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতি কষ্টে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্ধন শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে যাইল। গোবর্ধন শিরোমণি জনার্দন চৌধুরীর সভা-পণ্ডিত; অনেকগুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকের
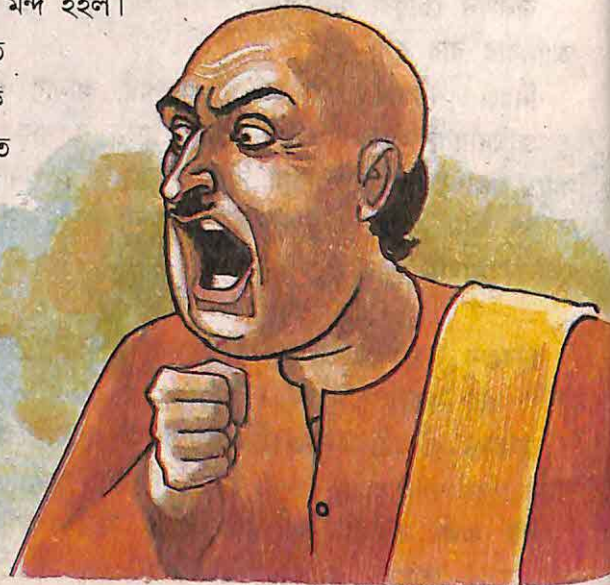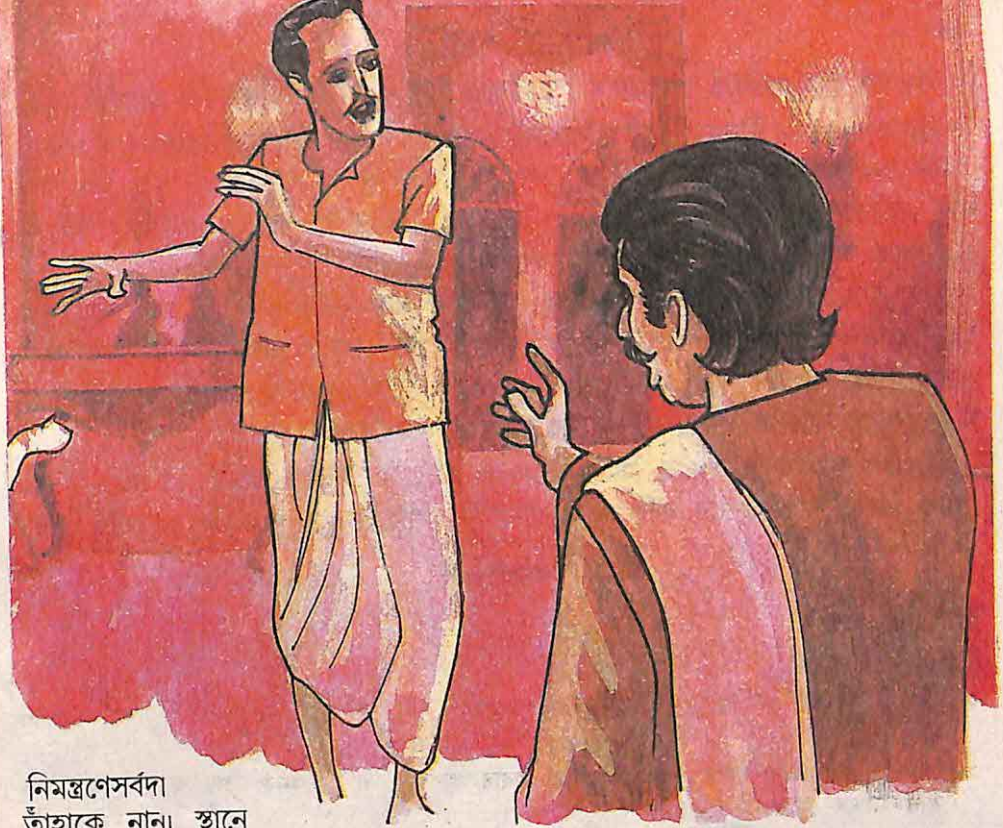
নিমন্ত্রণেসর্বদা
তাঁহাকে নানা স্থানে
গমানগমন করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ আপনা-আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

সে জন্য কিন্তু কেহ দুঃখিত নয়। গোবর্ধন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ, তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্যসুধা দান করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান্ লোক পাইলে শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় তিনি বাক্যসুধা বর্ষণ করিতে থাকেন। তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহারা সেই সুধা পান করেন।

একদিন জনার্দন চৌধুরীর বাটিতে আসিয়া তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন, গোবর্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তনু রায় বলিলেন, 'কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চৎ সন্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ শাস্ত্রে আছে? এরূপ শুল্কগ্রহণ করা তো ধর্মশাস্ত্রে একবোরেই নিষিদ্ধ।"

গোবর্ধন চুপি চুপি বলিলেন, "বল না, মহাভারতে আছে!"

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দাতা-কর্ণে আছে।"

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "রায় মহাশয়, কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ! পাপ করিতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু শাস্ত্রে দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।'

তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমি শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল, কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্রে করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?"

নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে, পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। নিরঞ্জন কবিরত্ন কে ছিলেন? ইনি কেমন লোক ছিলেন? ইনি কি করিতেন? [২+২+৬]

২। গোবর্ধন শিরোমণি কে? তাঁর বিদ্যাদান করার অবকাশ নাই কেন? তাঁর ছাত্ররা কি ভাবে তিনি কেমন লোক ছিলেন? [২+২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন চল।" কে কাকে এই কথা বলল? কেন ঠাকুর কি করছিলেন? শেষ পর্যন্ত তিনি কি করলেন? [২+২+২+৪]

২। "নিরঞ্জন কাগজখানি .... ফেলিয়া দিলেন"।
কাগজখানি আসলে কী ছিল? কাগজখানির কী হল?
জনার্দন চৌধুরী তখন কী বললেন? [৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। তনু রায় কে? তিনি নিরঞ্জনকে কেন দেখতে পারেন না? নিরঞ্জনের অবস্থা কেমন ছিল? [১+১+১]

২। বামুনমারীর মাঠ নিরঞ্জনের কত জমি ছিল? জমিদারের মাপে তা করত হল? জমিদারের প্রাপ্য কত জমি হল? [১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

সন্ধিবিচ্ছেদ কর: ব্রহ্মোত্তর, ধর্মানুষ্ঠান, নির্ধন, দিনাতিপাত।
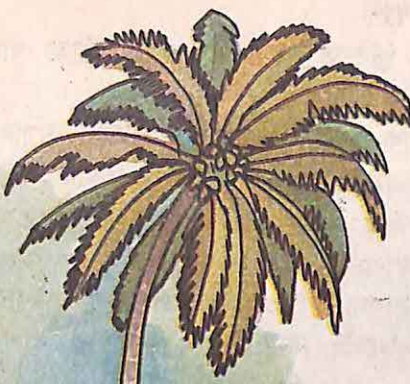
গাছের বংশ বিস্তার

জগদানন্দ রায়

রচনা প্রসঙ্গে

না প্রসঙ্গে: বাংলাভাষায় ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের অনেক বই লিখেছেন জগদানন্দ রায়। গাছপালা ম্বন্ধে তাঁর লেখা 'গাছপালা' নামক বই থেকে রচনাংশ গৃহীত। সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় য়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধটিতে গাছের বংশবিস্তার কিভাবে হয় তাই নিয়ে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

তোমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে যতগুলি আম খাইয়াছ, তাহাদের আঁঠি যদি উঠানের দু'হাত জমিতে গর্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখ, তবে আষাঢ় মাসে সেগুলি হইতে চারা বাহির হইবে। কিন্তু সেই ঘেঁষাঘেঁষিতে একটি চারাও বেশি দিন বাঁচিবে না। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? তাই আমের বাগান করিতে হইলে, আঁঠিগুলিকে কুড়ি-পঁচিশ হাত অন্তর পুঁতিতে হয়। ইহাতে তাহারা ডালপালা এবং শিকড় ছড়াইবার জায়গা পায় এবং মাটির তলায় অনেক খাবার পাইয়া তাড়াতাড়ি বড় হয়।

তোমাদের বাগানের জামগাছ-তলায় বীজ হইতে কত জামের চারাই বাহির হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? কিন্তু গাছের আওতায়, আলো ও খাদ্যের অভাবে সেগুলির একটিও বাঁচে না। তাই বাগানে নূতন জামের গাছ তৈয়ারি করিতে হইলে গাছতলার

ছোটো চারাগুলিকে দূরের ফাঁকা জায়গায় পুঁতিতে হয়। এই-রকমে পোঁতা গাছই ক্রমে বড় হয় এবং তাহাতে ফল ধরে।

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, তাই তাহারা ফাঁক ফাঁক করিয়া চারা পুঁতিয়া বাগান তৈয়ারি করে। যেখানে জনপ্রাণীর বসতি নাই, এমন জায়গার বনে কি-রকমে গাছের বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং হাজার হাজার নূতন গাছ জন্মায়, তাহা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? গাছের বংশবিস্তারের জন্য সেখানে মানুষের বুদ্ধির দরকারই হয় না। গাছের জ্ঞান-বুদ্ধি নাই এবং এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবারও শক্তি নাই। তাই জল, বাতাস, পশু পাখি সকলেই নানা রকমে উহাদের বংশ-বিস্তারের সাহায্য করে।
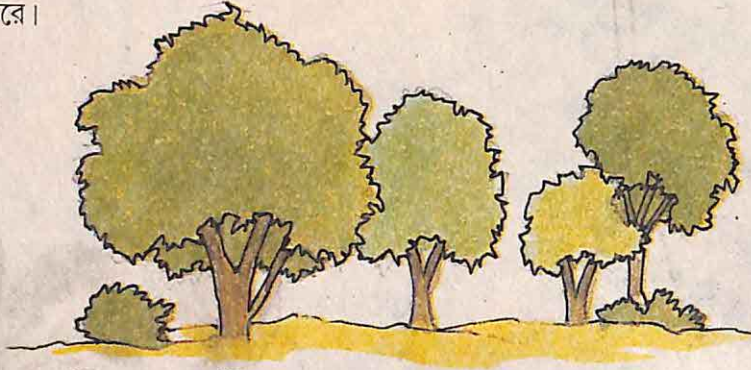
গাছের বংশ-বিস্তারের প্রণালীর কথাই এখন তোমাদিগকে বলিব।

মনে কর, তুমি নীচে দাঁড়াইয়া আছ এবং তোমার বন্ধু ছাদের উপরে আছে। এখন তোমার হাতে যে ক্রিকেট বলটি আছে, তাহা তোমার বন্ধুর কাছে দেওয়াদরকার। এই অবস্থায় তুমি কি কর? সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বলটিকে তোমার বন্ধু হাতে দিয়া আস কি? কখনই তাহা কর না। তুমি নীচে দাঁড়াইয়া বলটিকে উপরে ছুঁড়িয়া দাও এবং বন্ধু তাহা লুফিয়া লয়। নানা গাছের ফলে এইরকমে বীজ ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিবার ব্যবস্থা আছে। আমরুল ও দোপাটির যে ফল হয়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পাকিলে এইসব ফলকে আস্তে আস্তে লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, হাতের স্পর্শ পাইবামাত্র সেগুলির ভিতরকার বীজ ছিটকাইয়া দূরে পড়িবে। বীজগুলি যাহাতে গাছের তলায় আওতায় পড়িয়া নষ্ট না হয়, তাহারি জন্য এই সব গাছে বীজ ছুঁড়িয়া ফেলিবার এই রকম ব্যবস্থা আছে।

আমরা কেবল আমরুল ও দোপাটির ফলের কথা বলিলাম, খোঁজ করিলে তোমরা অনেক শুঁটি-ওয়ালা গাছকেই ঐরকমে বীজ ছুঁড়িতে দেখিবে। অপরাজিতার শুকনা পাকা ফল ফট্-ফট্ শব্দে ফাটিয়া যায় এবং তাহার বীজগুলি দুই তিন হাত দূরে ছিট্কাইয়া পড়ে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাই বাগানে একটি অপরাজিতা গাছ থাকিলে, যেখানে-সেখানে তাহার চারা বাহির হইতে দেখা যায়।

পট্-পটে্ ফল তোমরা দেখ নাই কি? ছেলেবেলায় ঝোপ-জঙ্গল হইতে তাহার যবের মতো ছোটো লম্বা লম্বা ফল যে কত সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার হিসাবই হয় না। তারপরে ফলের উপরে একটু জলের ছিটা দিয়াছি,— অমনি ফলগুলি ফট্‌ফট্ করিয়া ফাটিয়া চারিদিকে বীজ ছড়াইয়াছে।

আকন্দ, কার্পাস, শিমূল প্রভৃতির বীজ যাহাতে গাছ হইতে দূরে যায়, তাহার জন্য যে কি ব্যবস্থা আছে, তোমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছ। এ-সব বীজের কাহারো গায়ে, কাহারো মাথায় তুলা লাগানো থাকে। তুলা খুব পাতলা জিনিস। তাই বাতাস লাগিয়ে উহা এক জায়গায় স্থির থাকে না। কাজেই, কাপাস, আকন্দ প্রভৃতির বীজ উড়িতে উড়িতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে। মাথায় তুলার ঝুঁটিওয়ালা আকন্দের এবং মধুমালতীর বীজকে আমরা এক ক্রোশ দূরে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। করবী ও মালতী ফুলের গাছে যে লম্বা লম্বা শুঁটি হয়, তাহার ভিতরকার বীজগুলিকে তোমরা ঝুঁটি লাগানো দেখিতে পাইবে। সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি বহুপুষ্পক গাছের পুষ্পকগুলিতে ঝুঁটির বদলে, কাগজের চেয়েও পাতলা এক-একটা অংশ জোড়া থাকে, তাহাই বাতাসে উড়িয়া বীজগুলিকে দূরে ছড়াইয়া দেয়।

শাল ও মাধবীলতার ফলের পাখনার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। শালের ফলে পাঁচটা ও মাধবীলতার ফলে তিনটা পাখনা লাগানো থাকে। শালের ফলকে

দেখিলেই মনে হয়, যেন সেটি ব্যাডমিন্টন্ খেলার পালক লাগানো বল। শুকনা ফলগুলি গাছ হইতে ঝরিয়া কখনই গাছ তলার ছায়ায় পড়ে না— চাকার মতো বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেগুলি প্রায় আট দশ হাত তফাতে আসিয়া নামে। আমরা এই সব ফলের পাখনা কাটিয়া উঁচু হইতে ফেলিয়া দেখিয়াছি, এই অবস্থায় ফলগুলি কখনই দূরে ছড়াইয়া পড়ে না। সুতরাং বলিতে হয়, শাল ও মাধবীলতার ফলের পাখনাই, ফলগুলিকে ছড়াইয়া ফেলে।

পানিফলের গায়ে যে দুইটি ধারালো কাঁটা লাগানো থাকে, তাহা কোন কাজে লাগে, তোমরা বোধহয় চিন্তা করিয়া দেখ নাই। এই গাছ জলের তলায় পাঁকে জন্মে। ডাঙায় বা জলের তলাকার বেলে মাটিতে ইহারা বাঁচে না। বড় বড় মহাজনী নৌকায় যে-সব নোঙর থাকে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? নদীর কিনারায় নৌকা বাঁধিতে হইলে, মাঝিরা নোঙর জলে ফেলিয়া দেয়। ইহা কাদায় আট্‌কাইয়া গেলে, স্রোতের টানে নৌকা দূরে যাইতে পারে না। পানিফলের কাঁটা দুইটি নোঙরেরই কাজ করে। জলের তলায় পাঁক পড়িলেই উহা পাঁকে ডুবিয়া যায়, কিন্তু জমাট বালি মাটিতে ডুবে না। কাজেই পানিফল স্রোতের টানে দূরে না গিয়া, পাঁকের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা পায়।

ফল ও বীজ যেমন বাতাসে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি সেগুলি জলের স্রোতেও দূরে ভাসিয়া যায়। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? শুকনো পাকা নারিকেল ও সুপারির গায়ে পুরু ছোব্‌ড়া থাকে এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস থাকে। তাই জলে পড়িলেই এই সব ফল ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রের ধারের গাছ হইতে যে নারিকেলগুলি জলে পড়ে, তাহা অনেক সময়ে এইরকমে জলে ভাসিয়া এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গিয়া হাজির হয় এবং সেখানে অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের উৎপত্তি করে। পিটুলি ও কল্‌কে ফুলের গাছ খাল বিল ও নদীর ধারেই বেশি হয় এবং ইহাদের পাকা ফল প্রায়ই জলে ঝরিয়া পড়ে। এগুলিও নারিকেলের মতো ভাসিয়া দূরে নূতন গাছের সৃষ্টি করে। একটু লক্ষ্য করলে তোমরা আরো অনেক গাছের ফলকে এই-রকমে ভাসিয়া দূরে যাইতে দেখিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের বাগানে যে-সব হল্‌দে, সিঁদুরে রঙের পাকা আম ও লাল টক্‌টকে লিচু গাছে গাছে ঝুলিয়া থাকে, তাহাদের এমন সুন্দর রঙ্‌ কেন হয়, এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। এই সব ভয়ানক ভারী, কাজেই বাতাসে সেগুলিকে দূরে লইয়া যাইতে পারে না, বীজ ছড়াইবার জন্য পশুপক্ষী ও মানুষের সাহায্যের দরকার হয়। পাখি, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীরা সুন্দর রঙ্‌ দেখিয়া এই সব ফলের কাছে যায় এবং তার পরে ঠোকর মারিয়া যখন ইহাদের শাঁসের স্বাদ বুঝিতে পারে, তখন তাহা পেট ভরিয়া খায় এবং শেষে আধ-খাওয়া ফল মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়। এই-রকমে নানা জন্তু-জানোয়ারের সাহায্যে আম, জাম, লিচু, বট, অশথ, পেয়ারা, বাদাম, কুল, নেবু, সুপারি, তেলাকুচা, লঙ্কা, নিম বকুল প্রভৃতি কত গাছেরই ফল ও বীজ যে দুরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না।

তালের ফল প্রকাণ্ড বড়, তাই পাখি, ইঁদুর বা কাঠবিড়ালীতে ইহাকে দূরে লইয়া যাইতে পারে না। ভাদ্র মাসের পাকা তাল ধপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িলেই গরু-বাছুরেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহা খায় এবং আঁশ-ওয়ালা আঁঠিগুলির ঝুঁটি মুখে করিয়া দূরে ছড়াইয়া ফেলে।

সুতরাং দেখ, ফলের সুন্দর রঙ্‌ এবং সুমিষ্ট শাঁস তোমার বা আমার জন্য নয়। পশুপক্ষীদের ডাকিয়া আনিবার জন্যই ফলে এমন রঙের চটক এবং সুস্বাদু থাকে।
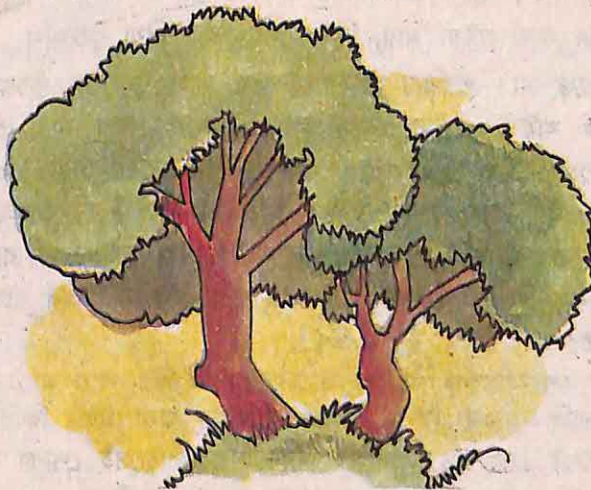
পেয়ারা, অশথ, বট, নিম প্রভৃতি ফলের বীজের উপর কার ছাল ভয়ানক শক্ত। পাখি বা অপর জন্তুরা এই সব বীজ গিলিয়া হজম করিতে পারে না। কাজেই, মলের সঙ্গে সেগুলি যেখানে পড়ে, সেখানেই অঙ্কুরিত হয়। এই-রকমে পাকা প্রাচীরের ফাটলে, এমন কি দোতলা-তেতালা পাকা বাড়ির মাথায় এবং মন্দিরের চূড়ায় আমরা বট, অশথ, নিম প্রভৃতি গাছকে জন্মিতে দেখিতে পাই।

কুঁচের বীজগুলি কেমন সুন্দর, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। দেখিলেই মনে হয়, কে যেন তুলি দিয়া তাহার মাথাগুলিতে কালো রঙ্‌ এবং নীচেতে সিঁদুরের রঙ লাগাইয়া পালিশ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ভিতরের শাঁস একটুও মিষ্ট নয়! তারপরে উপরকার ছাল এত শক্ত যে, দাঁত দিয়াও চিবানো যায় না। এ-রকম বীজে এত রঙের বাহার কেন? বীজগুলি যাহাতে দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, ইহা তাহারি আর এক ফন্দি।

কুঁচের শুঁটি পাকিলে তাহা কি-রকমে ফাটিয়া যায়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? ইহার একদিকের জোড়ের মুখ চিরিয়া ফাঁক হইয়া যায়, কিন্তু সেই ফাঁক দিয়া কুঁচগুলি মাটিতে ঝরিয়া পড়ে না। পাখিরা শুঁটির উপরে লাল টুক্‌টুকে কুঁচগুলিকে সাজানো দেখিয়া সেগুলিকে খাইয়া ফেলে, কিন্তু হজম করতে পারে না। তারপরে সেগুলি যেখানে পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে, সেখানেই তাহাদের চারা হয়।

লট্‌কন্‌ গাছ তোমরা হয়ত দেখিয়াছ এবং তাহার বীজ দিয়া কাপড় রঙ্‌ করিয়াছ। এগুলিও শুঁটি হইতে ঝরিয়া পড়ে না। বোকা পাখিরা লট্‌কনের রাঙা বীজগুলিকে উপাদেয় খাদ্য ভাবিয়া গিলিয়া ফেলে। তারপরে শরীর হইতে বাহির হইলে সেই বীজেই নূতন গাছ জন্মিতে থাকে।

পাখিরা ছোটো পোকামাকড় খাইতে ভালোবাসে। বৃষ্টির পরে মাঠে পোকা উড়িলে, কত কাক, কত শালিক, কত ফিঙে, পোকা ধরিবার জন্য মাঠে কিচিমিচি শুরু করে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। গরমের দিনে ঠাণ্ডা পাইলেই পোকা বাহির হয়, তাহা পাখিরা জানে। তাই পোকা শিকারের জন্য উহাদের এত চীৎকার। শুকনা গাঁদা ফুলে যে ছোটো ছোটো বীজ থাকে, দেখিলেই মনে হয় সেগুলি যেন এক-একটা ফড়িং। পাখিরা তাহাই ভাবে এবং বীজগুলিকে ঠোঁটে লইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

ঘাসের যে ফলগুলিকে আমরা ভাঁটুই এবং চোর-কাঁটা বলি তাহা দেখিয়াছ কি? এই ঘাসের মধ্য দিয়া গেলেই কাপড়ে চোর-কাঁটা ফুটিয়া যায়। সেগুলিতে ছুঁচের মতো

সরু শুঁয়ো লাগানো থাকে। কাপড়ে লাগিলে সেগুলিকে যতক্ষণ ছাড়ানো না যায়, ততক্ষণে কাঁটার খোঁচা সহ্য করিতে হয়। গায়ের লোমে আট্‌কাইলে গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্তুরাও চোর-কাঁটা প্রভৃতির ছুঁচের মতো হুলগুলিও তাহাদের বংশবিস্তারের জন্য।

যাহারা পশুপক্ষীদের গায়ে আট্‌কাইয়া বংশবিস্তার করে সে-রকম ফল যে আরো কত আছে তাহার সংখ্যা হয় না। আপাং অর্থাৎ চিড়্‌চিড়ের পাকা ফল কাপড়ে আট্‌কাইয়া যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? গরু-বাছুরের গায়েও আমরা এগুলিকে আট্‌কাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

পুকুর বা খালের ধারে যে চিরুনি ফলের গাছ হয়, তোমরা হয়ত তাহা দেখিয়াছ। এই গোল গোল ফলের গায়ে কাঁটা বসানো থাকে। আমরা ছেলেবেলায় এই ফল দিয়া মাথা আঁচ্‌ড়াইতাম। এগুলিও গরু-বাছুরের গায়ে লাগিয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

জলের ছিটে পাইলে আপনিই গড়াইতে গড়াইতে দূরে চলিয়া যায়, এ-রকম ফল তোমরা দেখ নাই কি? বোধহয় লক্ষ্য কর নাই। এক-রকম ঘাসের ফলে ইহা দেখা যায়। এই ফলের মাথায় এক-একটা ঢেউ-খেলানো আঁকা-বাঁকা শুঁয়ো লাগানো থাকে। শিশির বা বৃষ্টির ছিটা পাইলে সেই বাঁকানো শুঁয়ো যেমনি সোজা হইতে চায়, অমনি তাহা গড়াগড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই-রকমে এই ঘাসের ফলগুলি ক্রমে চারি পাঁচ হাত তফাতেও ছড়াইয়া পড়ে।

এক টুক্‌রো কাগজকে বাতাসে ছাড়িয়া দিলে, তাহা কি রকম ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। জঙ্গলের অনেক গাছের বীজের চারিদিকে কাগজের চেয়েও পাতলা ডানা জোড়া থাকে। এই সব বীজ গাছ হইতে খসিয়া পড়িলে, কাগজের টুকরার মতো বাতাসে ভাসিয়া দূরে ছড়াইয়া পড়ে। তোমরা চুকো-পালঙের ফলে ও সজিনার বীজে ঐ-রকম ডানা লাগানো দেখিতে পাইবে। বাতাস আট্‌কাইয়া সেগুলি যাহাতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা।

গোবরে-পোকা পাখিদের উপাদেয় খাদ্য। রেড়ি ভেরেণ্ডা এবং নাটা ফলের দাগ-কাটা শক্ত বীজগুলি যখন মাটিতে পড়িয়া থাকে, তখন মনে হয় যেন এক-একটা গোবরে-পোকা মাটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। পাখিরা কখনো কখনো এগুলিকে পোকা ভাবিয়াই পরম আনন্দে ঠোঁটে করিয়া দূরে লইয়া যায় এবং তার পরে যখন দেখে সেগুলি পোকা নয়, তখন ফেলিয়া দেয়। এইরকমের কতকগুলি গাছের বংশ অনেক দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

আঠা-লাগানো বীজ তোমরা দেখ নাই কি? বেল পরগাছা জাতীয় বাঁদ্‌রা, চাল্‌তা এবং সোঁদালের বীজে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। বেলের খোলা পুরু, তাই পাখিরা গাছ হইতে ইহা খাইতে পারে না। বেল পাকিয়া মাটিতে পড়িলেই চৌচির হইয়া ফাটিয়া যায়। তারপরে গরু-বাছুর ও পাখিরা যখন সেই ভাঙা বেল খাইতে আরম্ভ

করে, তখন আঠাওয়ালা বীজগুলি তাহাদের গায়ে-মুখে লাগিয়া যায়। শেষে সেগুলি শরীর হইতে যেখানে ঝরিয়া পড়ে সেখানেই তাহাদের গাছ হয়। সোঁদালের লম্বা লম্বা সুঁটির মধ্যে যে কালো রঙের আঠালো শাঁস থাকে তাহার মিষ্ট স্বাদ আছে। ইহার বীজও ঠিক ঐ-রকমে গরু-বাছুর এবং পাখিতে ছড়াইয়া ফেলে। মান্দা অর্থাৎ বাঁদরার ফলে শাঁস ভয়ানক আঠালো কিন্তু সুমিষ্ট। তোমাদের বাগানের বুড়ো আমগাছের ডালে খোঁজ করিলেই, বাঁদরার গাছ দুই চারিটি দেখিতে পাইবে। পাখিরা ইহার ফল খাইতে খুব ভালবাসে। খাইবার সময়ে যে-সব বীজ ঠোঁটে ও মুখে লাগিয়া যায়, ঠোঁট ঘসিবার সময়ে তাহারা সেগুলিকে অন্য বীজ এক গাছ হইতে অন্য গাছে গিয়া সেখানে বংশ-বিস্তার শুরু করে।

যখন দেশে লোকসংখ্যা অধিক হয় তখন দেশে বাসের অনেক অসুবিধা ঘটে। এই অবস্থায় তাহারা ঘর-বাড়ি করিবার জায়গা পায় না এবং দেশে যে খাদ্য জন্মে তাহাতে পেট ভরে না। তাই তাহারা আপন দেশ ছাড়িয়া পালায় এবং যে-দেশে অনেক জমি আছে অথচ বেশি লোকজন নাই সেইখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর যে-সব জায়গায় লোকের বাস ছিল না, এই রকমে সেখানে বিদেশী লোক বহু পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে। গাছপালারা মানুষের মত জাহাজে চড়িয়া বা রেলে চাপিয়া বিদেশে বাস করিতে যাইতে পারে না। এই কারণে চারিদিকে ছড়াইয়া সুখে-স্বচ্ছেন্দে জীবন কাটাইবার জন্যই উহাদের ফলে পূর্বোক্ত নানা ব্যবস্থা থাকে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১. 'খোঁজ করিলে অনেক শুঁটি-ওয়ালা গাছকেই ঐ রকমে বীজ ছুঁড়িতে দেখিবে।' কোন কোন গাছ এভাবে বীজ ছোঁড়ে? এছাড়া আর কিভাবে গাছেরা বীজ ছড়ায়? গাছের বীজ ছড়ানোতে প্রাণীদের ভূমিকা কি? [২+৪+৪]

২. নারিকেল ও সুপারির পাকা ফল জলে পড়লে কি হয়? এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নারিকেলের বংশবিস্তার কিভাবে হয়? আর কি কি গাছের বীজ জলে ভেসে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করে? [৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমের বাগান করতে আঁঠিগুলি কত দূর অন্তর পুঁততে হয়? এতে গাছের কি সুবিধা হয়? জামগাছ তলার বীজ থেকে যে চারা হয় তারা বাঁচে না কেন? [১+১+১]

২. বীজের গায়ে তুলা লাগানো থাকায় বীজের কি সুবিধা হয়? শালের ফলে পাখনা কি কাজে লাগে? পাকা তালের বীজ কিভাবে ছড়ায়? [১+১+১]

ব্যাকারণগত প্রশ্ন

১. অর্থ লেখ : ঘেঁষাঘেঁষি, স্বচক্ষে, বহুপুষ্পক, নোঙর, চটক, উপাদেয়, পূর্বোক্ত।

অপুর পাঠশালা
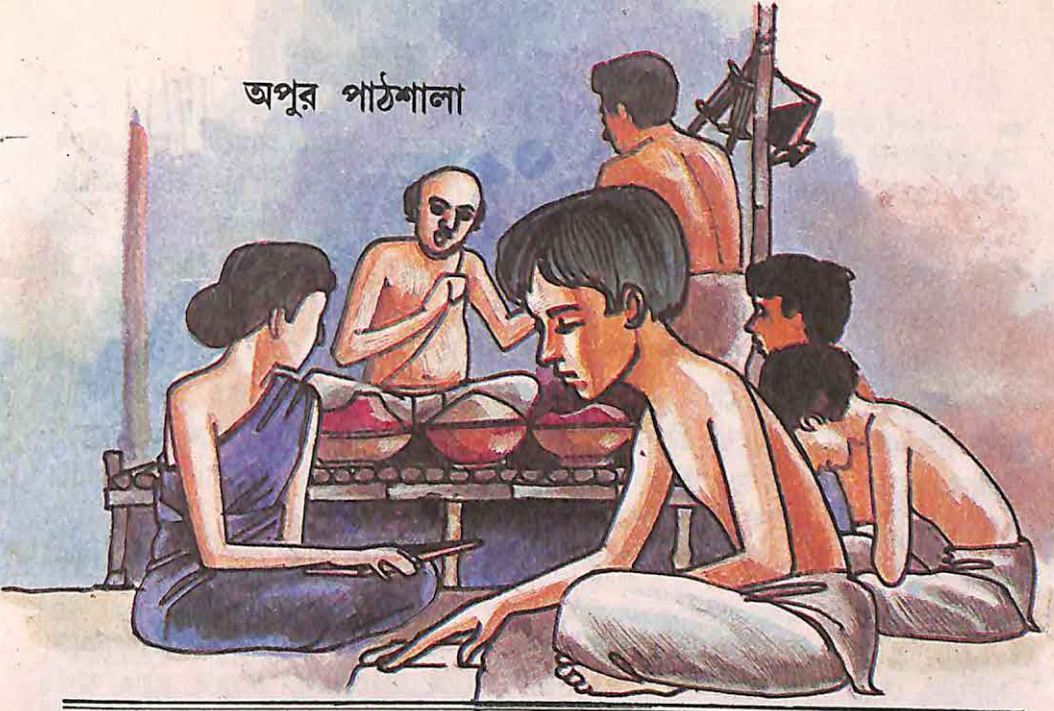
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

রচনা প্রসঙ্গে

> বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালি' গ্রন্থ থেকে আলোচ্য অংশটি গৃহীত। বিভূতিভূষণের এটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর পরবর্তী খণ্ড 'অপরাজিত' তোমরা বড় হয়ে নিশ্চয়ই পড়বে। বিভূতিভূষণের সমগ্র রচনার মধ্যে এদুটি গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময় আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো; এখন বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি করো না যেন। খানিকটা পরে অপু পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, গুরুমশায় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইয়ে বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল,

সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সাম্‌নে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—ফনে শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই দুটি ছেলে অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন,এই সতে, ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো? তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটে?—সতে, ধ'রে নিয়ে আয় তো দুজনকে? কান ধ'রে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিপন্নমুখে সাম্‌নের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমশায়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? হ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে এসো তো তেঁতুলতা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স

অল্প বলিয়া হউক বা নতুন ভর্ত্তি বলিয়া হউক গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আটদশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধার খোলা ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা, গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলী আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট দশটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শুনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌চিস? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে! নুটু, তোমার কবার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচে—

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইএর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়শুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথমে যৌবনে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস স্মরণ করিয়া কি করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়ত মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সাম্‌নে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ওপাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন! যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্ন্যাল মহাশয় দেশ-ভ্রমণ-বাতিক-গ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছ সান্ন্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশী আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে
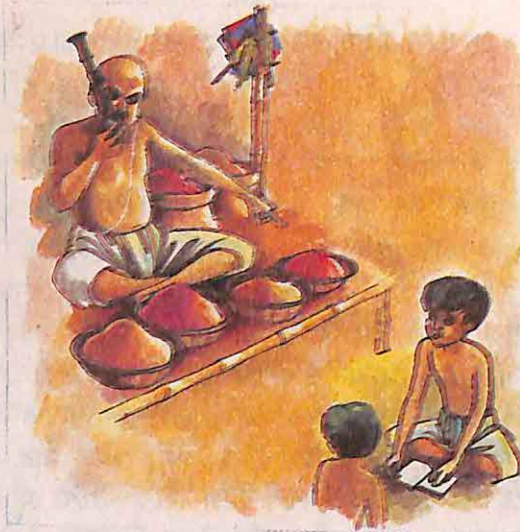
শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্ন্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্ন্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইত প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জ্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন এই যে প্রসন্ন কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচ যে। কটা মাছি পড়লো।

নামতা মুখস্ত-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্ন্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট, বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক-চোখদুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজ্‌রার ভাই চন্দর্‌ হাজ্‌রা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল— এখানে ওখানে বৃষ্টির জল্লের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর্‌ হাজ্‌রা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানা মত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজ্‌রা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্ন্যাল মশায়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারী হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে "প্যাঁড়া" কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্ন্যাল মশায় একটা কোন্ জায়গার গল্প করিতেছিলেন। কোন্ জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্ন্যাল মশায় বার বার যে জিনিষটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝিয়াছিল একটা ভাঙ্গা পুরানো বাড়ী। অন্ধকার প্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে— চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অম্নি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রানুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরীর মত অন্ধকার ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথ তলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়ত আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর তন্তরের খেলা আর কি? সে বার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে তখন একটা গল্প বলি শোনো, গল্প নয় আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙ্গার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি বাঁধা এক ধরনের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আস্তো। একশ বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়েসে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠ্তাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েসে, চাক্‌দার থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল

উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ খানা বসেছে?—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন-চারেক যণ্ডামাক্কোগোছের মিশ কালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইসারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। বেশ, আছে! এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদ্‌জী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষণো এরকম আর করিস্‌নি! তবে তারা-বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, অমনি ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেছে গাড়ীর সঙ্গে। একেবারে পেরেকআঁটা হ'য়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের জগডুমুরগাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়ো এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

রাজকৃষ্ণ সান্যালের কিসের বাতিক ছিল? বিদেশ থেকে ফিরে তিনি কীভাবে বাড়ি ঢুকতেন? তাঁকে দেখে অপুর কেমন লাগত? [২+২+৬]

২৫ বুধো গাড়োয়ান কত বছর বয়সে মারা যায়? তার কী গুন ছিল? তার মন্ত্রের জোরে কী হয়েছিল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

[২+২+৬]

১। "কোন্ দেশে সান্নাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন।" ফকির কোথায় থাকত? কী পেলে সে খুশি হত? ফকির খুশি হয়ে কী দিত? [২+২+৬]

২। পাঠশালা কখন বসত? সবশুদ্ধ কতজন ছাত্র সেখানে পড়ত? ছেলেরা কিসের উপর বসত? পাঠশালা ঘর ও তার চার পাশের বর্ণনা দাও। [২+২+২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

গুরুমহাশয় পড়ানো ছাড়া আর কি করতেন?

বাতাপি রাক্ষস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা প্রসঙ্গে

> অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একে তিন তিনে এক' নামক গ্রন্থ থেকে আলোচ্য অংশটি গৃহীত। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যে কথাশিল্পী হিসাবেও কতখানি দক্ষ ছিলেন তা 'বাতাপি রাক্ষস' নামক গল্পটি গড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে।

দণ্ডক অরণ্যের একদিকে অনেক মুনি ঋষির আশ্রম ছিল। আর একদিকে অনেক ক্রোশ জুড়ে অনেকখানি একটা বাতাপি নেবুর বন ছিল। সেই বনে দুটো অসুর ছিল—এক ভায়ের নাম ইল্বল আর এক ভায়ের নাম বাতাপি। ইল্বল একখানি পাতার কুটীরে তপস্বী সেজে বসে থাকত, আর বাতাপি একটা বাতাপি নেবুর গাছ হয়ে সেই বনে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকত।

বর্ষার শেষে সেই নেবুর বন সবুজ পাতায়, নেবুর ফুলে, বাতাপি নেবুতে ছেয়ে যেত। কত যে পাখি কত যে ভ্রমর কত যে মধুকর সেই বনে গান গাইত, ফুলে ফুলে উড়ে বসত, পাতার ফাঁকে চাক বাঁধত, তার আর ঠিকানা নাই। সেই সময় দক্ষিণ দিকে ঋষিদের আশ্রম থেকে দলে দলে ঋষিকুমার সেই বনে বাতাপি নেবু

পাড়তে আসত। তারা সারাদিন সেই নেবু বনের তলায় কচি ঘাসে শুয়ে পাখিদের গান শুনত, নেবু ফুলের মালা গাঁথত, কত খেলা খেলত, তারপর সন্ধ্যার সময় আঁচল ভরে রাশি রাশি নেবু, সুগন্ধ নেবু ফুল ঘরে নিয়ে যেত। যতদিন সেই বনে নেবু থাকত ততদিন তারা প্রতিদিন আসত, নেবু পেড়ে খেত, নেবু ফুল তুলত। অসুর ইল্বল তপস্বী সেজে বসে বসে সব দেখত, কিছু বলত না। তারপর যখন সব নেবু পাড়া হয়ে গেছে, বনে আর একটি গাছেও নেবু নেই, গাছের পাখি উড়ে গেছে, ফুলের ভ্রমর চলে গেছে, শীতের হাওয়ায় সবুজ পাতা ঝরে গেছে, শিশিরে ঘাস ভিজে গেছে, সেই সময় ভণ্ড তপস্বী ইল্বলের কুটীর-দুয়ারে মায়াবী সেই বাতাপি নেবুর গাছ সবুজ সবুজ পাতায় থোলো-থোলো ফুলে, বড় বড় নেবুতে ছেয়ে যেত। সেই গাছে কত পাখি গান গেয়ে উঠত, কত ভ্রমর গুনগুন করে তার চারিদিকে বেড়াত। সেই সময় সেই ভণ্ড তপস্বী ইল্বল গুটি-গুটি গিয়ে আদর করে সেই ঋষিকুমারদের হাত ধরে সেই মায়া বাতাপির তলায় যেত; পাকা-পাকা বড় বড় নেবু পেড়ে তাদের খেতে দিত, তারা মনের আনন্দে তাই খেত। হায়, তারা তো জানত না এ ঋষি ভণ্ড ঋষি এ ফল মায়াফল। যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত, বন আঁধার হত, বাপমায়ের কোলে ছোট ছোট সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্য সেই ছোট ছোট ঋষিকুমারদের প্রাণ আকুল হত তখন সেই রাক্ষস ইল্বল ডেকে বলত, আয় রে বাতাপি বাহিরে আয়। অমনি সেই ঋষিকুমারদের পেট চিরে বাতাপি নেবুর ভিতরে থেকে মায়াবী রাক্ষস বাতাপি বাহিরে আসত। তারপর সেই দুই অসুর মনের আনন্দে সেই ঋষিকুমারদের রক্ত পান করে, তাদের সেই বনে মাটিতে পুঁতে রাখত! এক একটি ঋষিকুমার এক একটি নেবু গাছ হয়ে থাকত।

যারা সেই সব গাছের নেবু খেত, তারা যেমন মানুষ তেমনি থাকত, আর যারা সেই ভণ্ড তপস্বীর কথায় ভুলে সেই মায়া গাছের মায়া ফল খেত তাদেরি পেট চিরে রক্তপান করে সেই দুই রাক্ষস নেবু বনে নেবু গাছ করে রাখত। এমনি করে সেই বনে কত যে নেবু গাছ হল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে তপোবনে আর একটিও ঋষিকুমার রইল না— সেই দুই রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেল্লে! ইল্বল, বাতাপি দেখলে
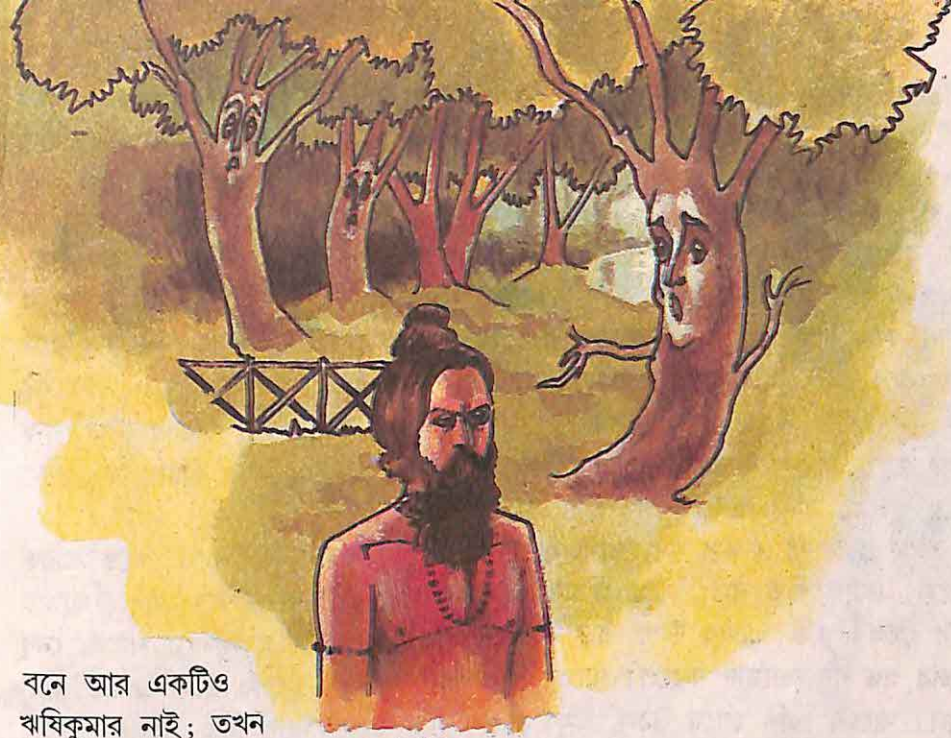
বনে আর একটিও
ঋষিকুমার নাই; তখন
তারা সেই ঋষিদের খাবার পরামর্শ আঁটতে
লাগল; সারারাত দুজনের পাতার কুটীরে মিটমিটে আলোয় ফুসফুস পরামর্শ চোল্লো। শেষে ভোর বেলা ইল্বল যেমন তপস্বী ছিল তেমনি হল। আর বাতাপি ঘোরান শিং পাকান রোম মোটা-সোটা একটা ভেড়া হল। সেই ভেড়াকে গাছে বেঁধে ভোর বেলা ইল্বল ঋষিদের আশ্রমে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ইল্বল ঋষিদের বল্লে, আজ আমার বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ— আপনারা সবাই আমার আশ্রমে পায়ের ধূলো দেবেন। সে ঋষিদের মত এমনি সব কথা কইলে যে ঋষিরা কিছুতে জানতে পারলেন না যে সে রাক্ষস। তাঁরা মনের আনন্দে তপোবনসুদ্ধ সব ঋষি সেই দুই অসুর ইল্বল বাতাপির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ইল্বল আদর করে ঋষিদের আশ্রমে ডেকে নিলে— নেবুর বনে, সবুজ ঘাসে, কুশাসনে তাঁদের বসতে দিলে। তারপর বাতাপি রাক্ষস গাছের তলায় ভেড়া হয়ে বাঁধা ছিল তাকে কেটে যত্ন করে রেঁধে সেই ঋষিদের খেতে দিলে। নেবুবনে ঋষিকুমারেরা নেবুগাছ হয়েছিল, এদেরি তলায় বসে ঋষিরা বাতাপি অসুরের মাংস খেতে লাগলেন। তারা পাতা নেড়ে, ডাল দুলিয়ে ঋষিদের সেই মাংস খেতে কত বারণ করলে, কিন্তু ঋষিরা কিছুই বুঝতে পারলেন না; আনন্দ মনে সেই মায়া মাংস খেতে লাগলেন। তারপর খাওয়া শেষ হলে ঋষিরা চলে যান, এমন সময় ইল্বল

ডাকলে—আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়! অমনি সেই রাক্ষস বাতাপি দয়ার সাগর সেই ঋষিদের পেট চিরে হাসতে হাসতে দেখা দিল। তারপর দুই ভায়ে সেই হাজার হাজার ঋষির রক্ত পান করে তাঁদের নেবু বনে গাছ করে রেখে দিল। সে বনে আর একটি মানুষ রইল না।

সেই সুন্দর তপোবন কাঁটা বনে ভরে গেল। পোষা হরিণ বুনো হয়ে বনে চলে গেল; ঋষিদের কুটীরে বনের জন্তুরা বাসা বাঁধলে। দুই অসুরে ঋষিদের তপোবন একেবারে শ্মশান করে দিল। দিনে দুপুরে সে বনে আর মানুষ চলত না, যদি কেউ সে বনে যেত তবে সেই দুই রাক্ষস তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার রক্ত পান করে সেই নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিত। ক্রমে সেই নেবুর বন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নেবুর গাছে একেবারে মহা অরণ্য হয়ে উঠলো। নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিক্‌বিদিক ছেয়ে ফেল্লে, মানুষ চলবার পথ রইল না!

তখন সেই দুই রাক্ষস বন থেকে হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক ধরে ধরে খেতে আরম্ভ করলে। শেষে শীত কাল গিয়ে আবার বর্ষাকাল এল; নেবু বনের মাথা সবুজ পাতায় ভরে গেল। কচি ঘাসের উপর বড় বড় নেবু ডাল পালা নিয়ে লতিয়ে পড়ল; নেবু ফুলের গন্ধ বন আমোদ করলে। গাছের পাখি চাকের মধুপ, ফুলের ভ্রমর আবার দেখা দিলে। গাছের পাখি গেয়ে উঠল, ভ্রমর গুঞ্জন করে উঠল, মধুপ চাক বাঁধতে লাগল; কিন্তু একটিও মানুষ, একটিও ঋষিকুমার সে বনে দেখা দিল না। পাকা নেবু ডাল থেকে খসে খসে পড়ে গেল বাতাপি নেবুতে সবুজ ঘাস ছেয়ে গেল, তবু সে বনে একটি মানুষ এল না।

মানুষের আশায় নিরাশ হয়ে সেই দুই অসুর সেই নিঝুম নেবু বনে দিন রাত্রি মেঘের কড়মড় বৃষ্টির ঝরঝর ঝড়ের হু হু শব্দ শুনতে শুনতে যেন পাগল হয়ে উঠল। পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল। যেদিকে চায় সেইদিকেই নেবু গাছ; গাছের পর গাছ, যত মানুষ মেরেছে, যত ছোট ছোট ছেলে খেয়েছে সবাই নেবু গাছ হয়ে নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিক্‌বিদিক ছেয়ে ফেলেছে। এই ঘোর বনে পাতা, লতা, নেবুর কাঁটা ঠেলে মানুষ কি আসতে পারে? কার এত সাহস! সেই দুই অসুর একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন রাক্ষসদের যম মহামুনি অগস্ত্য তীর্থ করে সেই দণ্ডক অরণ্যে এসে দেখলেন সেখানে সে তপোবন নাই, সে ঋষিরাও নাই, সেই শান্তশিষ্ট ঋষিকুমার— তারাও নাই। পাতার কুটীর ভেঙে পড়েছে, মাটির ঘরে ফাট ধরেছে! ধানের ক্ষেত, কুশের বন ফুলের বাগান কাঁটা গাছে ছেয়ে ফেলেছে। তপোবন যেন শ্মশান হয়েছে। এমন তপোবন কে এমন করেছে? মহামুনি অগস্ত্য সেই কাঁটার বনে ধ্যানে বসলেন; ঋষিদের কথা, ঋষিকুমারদের কথা, সেই দুই রাক্ষসের কথা, সব জানতে পারলেন। তখন মহামুনি অগস্ত্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, লাঠি হাতে গুটি-গুটি ভর সন্ধ্যাবেলা সেই বাতাপি নেবুর বনে দেখা দিলেন। বনের যত গাছ ডাল দুলিয়ে

পাতা নেড়ে তাঁকে ফিরে যেতে বল্লে। কাঁটা ঘেরা মোটা ডালে তাঁর পথ আগলে ধরলে। ঋষি তাদের অভয় দিলেন। তখন সেই মানুষের বন শান্ত হল, পাতা নড়া, ডাল দোলা বন্ধ হল, কাঁটা ঘেরা নেবুর ডাল পথ ছেড়ে দিলে— ঋষি চল্লেন। এতদিনে সেই বনে মানুষের গন্ধ পেয়ে সেই দুই রাক্ষসের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বাতাপি তখন এক ভেড়া হল, আর ইল্বল তাকে গাছে বেঁধে তপস্বী সেজে অগস্ত্য মুনির কাছে গেল। তাঁকে আদর করে ঘরে এনে কুশাসনে বসতে দিলে, হাত পা ধুতে জল দিলে। তারপর যত্ন করে সেই মায়া ভেড়ার মায়া মাংস কলার পাতায় গাছের তলায় সেই ঋষিকে খেতে দিলে, ঋষি খেতে লাগলেন।

রাক্ষস যত দেয় ঋষি তত খান; খাওয়া শেষ হয় না। শেষ যখন সব মাংস খাওয়া হল, তখন ঋষি উঠলেন। ইল্বল ডাকলে, আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়! কিন্তু বাতাপি আর বাহিরে এল না। ইল্বল কত ডাকাডাকি করলে তবু এল না। অগস্ত্য ঋষির পেটে আগুন জ্বলছিল, তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষস ইল্বল ভাই বাতাপির শোকে পাগল হয়ে উঠল; ভয়ঙ্কর নিজ-মূর্তি ধরে আকাশ পাতাল হাঁ নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে অগস্ত্য ঋষিকে গিলতে চল্লো। অগস্ত্য কি সামান্য ঋষি! এক গণ্ডূষে

সাগরের জল পান করেন, রাক্ষস কাছে আসতেই তাকে ভস্ম করে ফেল্লেন। রাক্ষসের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কতক ছাই হাওয়ায় উড়ে গেল, কতক ছাই জলে ধুয়ে গেল, একমুঠা রইল। সেই ছাই মুঠা নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্য সব নেবু গাছের তলায় ছড়িয়ে দিলেন। যে সব ঋষিরা যে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়ে ছিল তারা আবার যেমন মানুষ ছিল তেমনি মানুষ হল। আবার সেই কাঁটা ভরা তপোবন, পাতার কুটীর, মাটির ঘরে ছেয়ে গেল; ধানের ক্ষেত সোনার ধানে ভরে গেল, ফুলের বাগানে ফুল ফুটে উঠল। ঋষিকুমারেরা মনের আনন্দে সেই নেবুর বনে নেবু পেড়ে নেবু ফুলের মালা গেঁথে মনের আনন্দে খেলে বেড়াতে লাগল; আর রাক্ষসের ভয় রইল না।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। ইল্বল আর বাতাপি কি সেজে থাকত? বনের বাতাপি লেবু ফুরালে ঋষিকুমারেরা কোন বাতাপি নেবু খেত? খেলে শেষ পর্যন্ত কী হত। [৩+৩+৪]

২ ঋষিদের খাবার জন্য বাতাপি নূতন কি বেশ ধারণ করল? ইল্বল তাঁদের কি ভাবে অভ্যর্থনা খেতে বসলে পর কারা তাঁদের খেতে বারণ করেছিল? ঋষিরা তাঁদের বারণ বুঝতে পারেন নি কেন? [২+২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "সেই সুন্দর তপোবন কাঁটা বনে ভরে গেল।"
কোন তপোবনের কথা এখানে বলা হয়েছে? কারা ওখানে উৎপত্তি করত? তারা কিভাবে ঋষিদের মেরেছিল? [২+২+৬]

২। "এমন তপোবন কে এমনগ করেছে"
একথা কে বললেন? তিনি কোথা থেকে ফিরেছেন? তিনি কার ছদ্মবেশ ধরলেন? বাতাপি লেবুর কেন তাঁকে ফিরে যেতে বলল? [২+২+৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মুনি ঋষিদের আশ্রম কোথায় ছিল? বনের দুটো অসুরের নাম কি? ঋষিকুমারেরা সেখানে [১+১+১]

২। বাতাপির শোকে ইল্বলের অবস্থা কি হল? সে রেগে গিয়ে কি করল? তার মৃত্যু কিভাবে হল? [১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

শব্দার্থ লেখ: অরণ্য, মধুকর, তপোবন, চঞ্চল, ভণ্ড, মায়াবী।
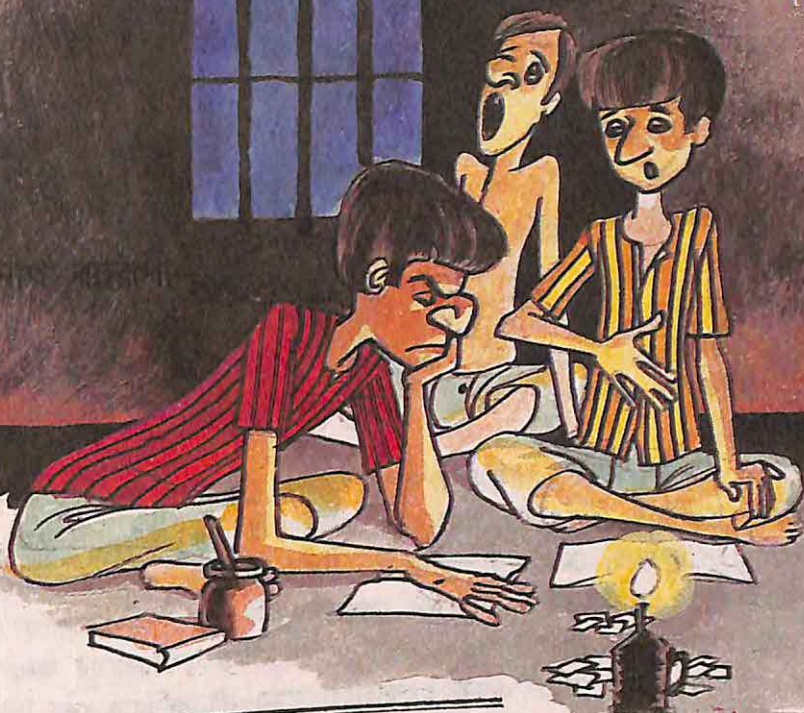
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রচনা প্রসঙ্গে

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত: প্রথম পর্ব' থেকে রচনাংশ নেওয়া হয়েছে। একজন নিরীহ বহুরূপীর বাঘের বেশে হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় একটি পরিবারে সাময়িক কি বিপর্যয় ঘটেছিল লেখক সরস ভাষায় তারই বর্ণনা করেছেন। ঘটনার চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্যপ্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের

খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে-সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের পড়ার বিঘ্ন না করি , এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া

একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ত তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রতহ এই দেড়ঘন্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাশের মধ্যে যে-সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যায়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইন সঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ এবং' সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আোঁ-আঁ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া

গেল। দরওয়ায়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিগা দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!—আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখেমুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন? ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও'ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থি। সে বোধ করি সুমুখের রাস্থা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবা, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিগা উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল না, বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার

করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরো অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস একবাড়ি লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বৈঠকখানায় কারা বসে পড়াশুনা করছিল? তাদের নাম কি? তাঁদের দেখাশোনা কে করছিল? পড়ার সময় কতক্ষণ ছিল? টিকিটগুলি কি কাজে ব্যবহার হত? [২+২+২+৪]

২। দরওয়ানেরা চোর মনে করে যাঁকে মেরেছিল তিনি কে? মারার পর রেওয়ানরা কি করল? চোরের মুখ দেখে বাড়ির লোকেরা কি করল? ডালিমগাছের ঝোপে জানোয়ারকে দেখে সবাই কি করল? [২+২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধহয়।"

কে একথা বলল? এ কথা শোনার পর বাঘ কি করল? ভট্টাচায্যি মশাই কি করলেন? ছিনাথ কেন আড়ালে গিয়াছিল? [২+২+২+৪]

২। "রেখে দাও। ওটা তোমার অনেক কাজে লাগবে।" কে এই কথা কাকে বললেন? ছিনাথের লেজ কাটার হুকুম কে দিয়েছিলেন? ঘটনা দেখে পিসীমা কি মন্তব্য করেছিলেন? [৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মেজদার পরীক্ষার ফল কেমন হত? মেজদার কিসের ব্যামো ছিল? বাঘ দেখে সে কি করল? [১+১+১]

২। বিপদের সময় হঠাৎ কে এসে উপস্থিত হল? তাকে সবাই কি বলে সাবধান করল? সে কি করল? [১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

সন্ধিবিচ্ছেদ কর: সমাচ্ছন্ন, তন্দ্রভিভূত, বিদ্যুদ্‌বেগে, পরিষ্কার, বিদ্যাভ্যাস, উত্তরোত্তর, সদুত্তর।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক
(৭৮-১০২ খ্রীষ্টাব্দ)

দীনেশচন্দ্র সরকার

রচনা প্রসঙ্গে

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও ভারততত্ত্ববিদ দীনেশচন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী' নামক বই থেকে কাহিনীটি নেওয়া হয়েছে। দীনেশচন্দ্র তাঁর গুরুগম্ভীর রচনার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের জন্যও কেমন সহজ ভাষায় ইতিহাসের কাহিনী লিখেছেন তার এটি একটি নমুনা। কুষান সম্রাট কনিষ্ক নানা কারণে ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত। শকাব্দ তাঁরই নামে প্রচলিত।

প্রায় এক হাজার নয়শত বৎসর পূর্বে কুষাণবংশের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ কণিষ্ক পুরুষপুরনগরে রাজত্ব করতেন। প্রাচীন 'পুরুষপুর' নামটি মধ্যযুগে 'পুরুষাবর' বা 'পর্ষাবর' আকার ধারণ করেছিল; এটা বর্তমান 'পেশোবর' বা 'পেশোয়ার'। অনেকে বলেন যে, কণিষ্কের সাম্রাজ্য পূর্বে বিহারের প্রান্ত হতে পশ্চিমে খোরাসানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উত্তরে মধ্যএশিয়াস্থিত খোতান এবং দক্ষিণে দক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্বভারতের বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় কুষাণবংশের স্বর্ণ ও তাম্র-মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলগুলি প্রথম কণিষ্কের আমলে

কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে বোধহয়। প্রথম শতাব্দীর একখানি গ্রীকগ্রন্থে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে প্রচলিত এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। ভারতে কুষাণরাজারাই সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন; তাই ঐ উল্লেখ কুষাণ-অধিকারের দ্যোতক বলে বোধহয়। এখন জানা গিয়েছে যে কণিষ্কের ২৩ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল ৭৮ খ্রীস্টাব্দেই আরম্ভ হয়েছিল। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী কুষাণরাজ বিম কদফিস-এর ৩২ খ্রীস্টাব্দের একখানি অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে। পিতার আশীর অধিক বয়সে মৃত্যু ঘটলে তিনি প্রৌঢ়বয়সে রাজা হন; তাই তিনি অবশ্যই ৪৫।৪৬ বৎসরের বেশী রাজত্ব করেন নি, অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব ৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল। কণিষ্কের প্রথম রাজ্যবর্ষ থেকেই ৭৮ খ্রীস্টাব্দে শকাব্দের আরম্ভ হয়।

সম্রাট্ কণিষ্ককে 'দেবপুত্র' বলা হত; প্রাচীনকালের লোকে তাঁকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করত। রাজধানী পুরুষপুরে সম্রাট্ চার শতাধিক হস্ত উচ্চ এক বিরাট্ বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন। এই 'কণিষ্কবিহার' বা 'কণিষ্কচৈত্য' শত-শত বৎসর ধরে এশিয়ার একটা দর্শনীয় বস্তু ছিল।

একদিন সম্রাট্ কণিষ্ক রাজসভায় বসেছেন। বিভিন্ন দেশের রাজদূতগণ স্ব-স্ব প্রভূর প্রেরিত উপঢৌকনসমূহ এনে উপস্থিত করল। উপহাররাশির মধ্যে কান্যকুব্জরাজের প্রেরিত দ্রব্যগুলি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ তার মধ্যে একখানি অতিসুন্দর বস্ত্র ছিল। সম্রাটের মনে হল তিনি কখনো এমন সুন্দর বস্ত্র দেখেন নি। ঐ বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সম্রাট্ একটি রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করার সংকল্প করলেন। তৎক্ষনাৎ সূচিক অর্থাৎ দরজি ডেকে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করার আদেশ দেওয়া হল।

সূচিজীবীর কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় সম্রাট্ উৎসুকচিত্তে কাল কাটাতে লাগালেন। এক সপ্তাহ কেটে গেল; কিন্তু সূচিক রাজপরিচ্ছদ তৈরী করে দিতে এল না। সম্রাট্ বিস্মিত হলেন; বিরক্তও কম হলেন না। একটিমাত্র পরিচ্ছদ নির্মাণ করতে পুরুষপুরের শ্রেষ্ঠ সুচিকের এতো বিলম্ব হবে কেন? সুচিক কি রাজাধিরাজ কণিষ্কের বিরাগের ভয় করে না? সম্রাট্ তাকে ধরে আনতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রহরীরা হতভাগ্যকে
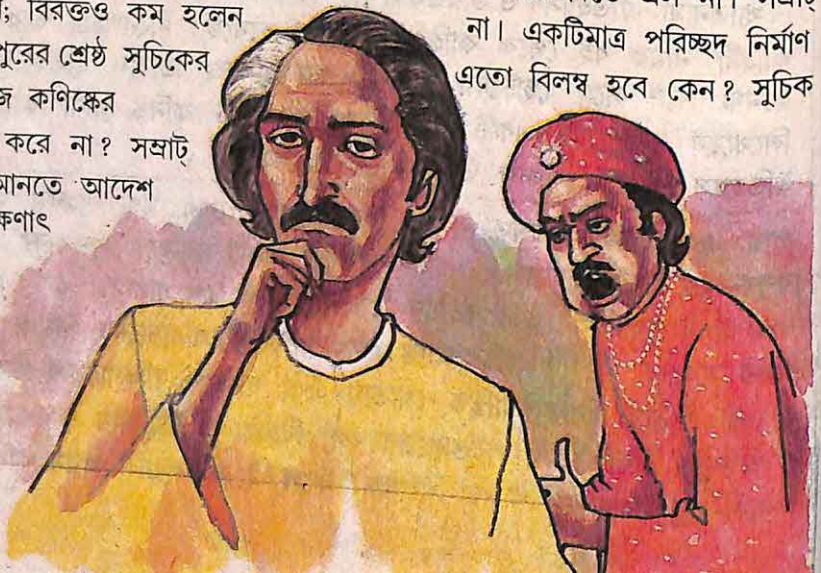
বেঁধে এনে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করল। সূচিক সেই বস্ত্রখণ্ড রাজার পদতলে রেখে কেঁদে বলল, "মহারাজ, রক্ষা করুন; আমি কোনো অপরাধ করিনি।" সম্রাট্ সক্রোধে বললেন, "তোর স্পর্ধা তো কম নয়! আমার পরিচ্ছদ কোথায়?" সূচিক কাতর হয়ে উত্তর দিল, "প্রভু ক্ষমা করুন। আমার প্রাণ গেলেও এই বস্ত্রে আপনার পরিচ্ছদ তৈরি করতে পারব না।" কণিষ্ক বিস্মিত হয়ে সূচিজীবীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে করজোড়ে বলল, "মহারাজ, বস্ত্রখানির একস্থানে মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই বস্ত্র আমি যেভাবে কেটেই পোশাক তৈরি করি, ঐ পদচিহ্ন পিঠের ঊর্ধ্বভাগে পড়বে। বহু চেষ্টাতেও আমি ঐ চিহ্নিতস্থান ত্যাগ করে পরিচ্ছদ নির্মাণ করতে পারলাম না।"

সম্রাট্ বুঝলেন যে, কান্যকুব্জরাজ কৌশলে তাঁর পৃষ্ঠে পদাঘাতের ইঙ্গিত করেছেন। দারুণ ক্রোধে তাঁর সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি সূচিজীবীকে বিদায় দিলেন। তৎক্ষনাৎ সেনাপতিকে ডেকে সম্রাট্ সৈন্যসজ্জার আদেশ দিলেন। সামান্য কান্যকুব্জের নরপতি রাজাধিরাজ কণিষ্কের অবমাননা করে নিরাপদে রাজত্ব করবে, এটা অসহ্য। তাকে এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিফল দিতেই হবে।

এদিকে সসৈন্যে কণিষ্কের আগমন সংবাদে কান্যকুব্জনগরে হাহাকার পড়ে গেল। ভয়ে কান্যকুব্জরাজের মুখ শুকাল। প্রজারা দলে-দলে নগর ছেড়ে পলায়ন করতে লাগল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "মন্ত্রী, সর্বনাশ উপস্থিত। আমি প্রাণ এবং রাজ্য দুটোই হারাতে বসেছি। কণিষ্কের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের উপায় কর।" বৃদ্ধ মন্ত্রী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, পরে ধীরে ধীরে বললেন, "মহারাজ, আপনি কালসর্পের পুচ্ছ দলিত করেছেন। কুষাণসম্রাট্‌কে পদচিহ্নিত বস্ত্র উপহার দেওয়া আপনার পক্ষে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কাজ হয়েছে। কণিষ্কের ক্রোধাগ্নি হতে আপনাকে রক্ষা করার উপায় তো আমি দেখি নে।" রাজা মন্ত্রীর হাত ধরে ব্যাকূল হয়ে বললেন, "মন্ত্রী, যা হয়ে গিয়েছে, সেজন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই। খেয়াল এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি অন্যায় কার্য করে ফেলেছি। কিন্তু অবশ্যই তুমি বুদ্ধিকৌশলে আমাকে রক্ষা করতে পার। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের অসাধ্য কিছুই নেই।"

প্রবীণ মন্ত্রী বহুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "মহারাজ, একটি উপায় আমার মাথায় এসেছে। আপনাকে যা বলি, তা প্রতিপালন করতে দ্বিধা করবেন না। এখনই চণ্ডাল ডেকে আমার হস্ত ও নাসিকাদি ছেদন করতে আদেশ দিন। তারপরের যে ব্যবস্থা তা আমি করব।" প্রিয় মন্ত্রীকে অঙ্গহীন করতে কান্যকুব্জরাজের অত্যন্ত কষ্ট হল। কিন্তু নিজের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে মন্ত্রীরত পরামর্শ অনুসারেই চলতে হল। অঙ্গহীন হয়ে মন্ত্রীকে বীভৎস দেখাতে লাগল। শরীরের অসহ্য যন্ত্রনা তিনি অগ্রাহ্য করলেন। প্রভুকে প্রণাম করে মন্ত্রী অবিলম্বে রাজধানী ত্যাগ করলেন। তিনি কোথায় গেলেন, কেউ তা জানতে পারল না।

কান্যকুব্জরাজ্যের সীমান্তে রাজাধিরাজ কণিষ্ক শিবির সংস্থাপন করেছেন। একদিন তিনি হস্তিপৃষ্ঠে শিবির হতে বের হচ্ছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাতীর সন্মুখে শুয়ে পড়ল। তার কাটা হাত, কাটা নাক হতে রক্ত ঝরছিল। তাকে দেখে বোঝা গেল, সম্প্রতি সে গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করেছে এবং প্রাণভয়ে সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। কণিষ্ক সদয় হয়ে তার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করলেন। এ লোকটি আর কেউ নয়; আমাদের পুর্বপরিচিত কান্যকূব্জরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। সে নিবেদন করল, "রাজাধিরাজ, আমি চিরদিন আমার প্রভু কান্যকুব্জপতিকে কুষাণসম্রাটের বশীভূত থাকতে পরামর্শ দিয়ে এসেছি; কিন্তু কান্যকুব্জরাজ আপনার বিরোধী হতে চান। আপনার পক্ষপাতী বলে আমার প্রভু পূর্বহতেই আমাকে কুনজরে দেখতেন। তাই আপনার কান্যকুব্জ-আক্রমণের প্রাক্কালে আমাকে রাজদ্রোহের শাস্তি দিয়ে তাঁর রাজ্য হতে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। আমিও অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্প করে আপনার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি।" কণিষ্ক হেসে বললেন, "মন্ত্রী, অচিরেই তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমি কান্যকুব্জ অধিকার করে কান্যকুব্জরাজকে যমালয়ে পাঠাব।" সম্রাটের আদেশে অভিজ্ঞ রাজবৈদ্যগণ ছিন্নাঙ্গ মন্ত্রীর ক্ষতগুলির পরিচর্যা করলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কান্যকুব্জের রাজমন্ত্রী কণিষ্ককে বললেন, "সম্রাটের হাতে কান্যকুব্জরাজকে পরাজিত ও নিহত দেখলে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াবে। কিন্তু তা হবার নয়। কারণ আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে রাজা কান্যকুব্জ হতে পলায়ন করেছেন। তিনি কোনো মিত্র-নরপতির আশ্রয়ে পৌঁছতে চেষ্টা করছেন। বর্তমানে তিনি যেস্থানে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে পৌঁছবার একটি সহজ পথ আমার জানা আছে। কিন্তু সে বড় ভয়ানক পথ। সে পথে যেতে হলে এক প্রকাণ্ড মরুভূমি অতিক্রম করতে হয়। সৈন্যেরা যদি পনর দিনের উপযুক্ত পানীয় জল সঙ্গে বয়ে না নেয় তবে

সকলকেই জলহীন মরুভূমিতে পিপাসায় প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু এপথে যেতে পারলে অনায়াসে মহিষীগণ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে কান্যকুব্জরাজকে বন্দী করা যাবে।" সম্রাট্ বললেন, "জলের ব্যবস্থা করতে অসুবিধা হবে না। আমি এখনই সৈন্যগণকে আদেশ দিচ্ছি। তুমি এই সহজ মরুপথে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।"

কান্যকুব্জের অঙ্গহীনমন্ত্রী অগ্রবর্তী হলেন। বিরাট্ সেনাদলের সঙ্গে রাজাধিরাজ কণিষ্ক তাঁর অনুসরন করতে লাগলেন। শীঘ্রই কুষাণসৈন্য এক বিশাল মরুভূমিতে উপস্থিত হল। সম্রাট্ কান্যকুব্জ-মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মরু অতিক্রম করে চললেন। পনর দিনে সেনাদলের সমস্ত পানীয় জল নিঃশেষ হয়ে গেল। সম্রাট্ নিজেও দারুণ জলাভাব অনুভব করতে লাগলেন। আরো দু-তিন দিন পথ চলতে-চলতে জলকষ্ট চরম অবস্থায় পৌঁছল; কিন্তু এখনও মরুপথ শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। সম্রাট্ কান্যকুব্জরাজের মন্ত্রীকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "ভদ্র তুমি ভুল কর নি তো? তুমি যে-কদিনের কথা বলেছিলে, পথে তদপেক্ষা অধিক দিন অতিবাহিত হল; অথচ এখনও সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। তৃষ্ণায় সেনাদল মৃতপ্রায়। এখন বল দেখি, আমাদের গন্তব্য পথের আর কতটুকু বাকী?"

কান্যকুব্জের রাজমন্ত্রী হাস্য করে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, শত্রুশিবির বহুদূরে রয়েছে বটে, কিন্তু যমালয়ে পৌঁছতে আমাদের আর অধিক বিলম্ব হবে না। এবার আর আপনার রক্ষা নেই; ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করুন। আমরা মরুভূমির মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়েছি। এখান হতে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। জলাভাবে আমাদের সকলকেই এখানে মরতে হবে। আমি ইচ্ছা করেই আপনাকে এই নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে টেনে এনেছি। আজ আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার আমার হত্যার আদেশ দিলেও আমি ক্ষুণ্ণ হব না।"

সম্রাট্ কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন; পরে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কি?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এর জন্য ভগবান্ আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আমার প্রভু কান্যকুব্জরাজের প্রাণ ও রাজ্য-রক্ষার জন্যই একাজ করেছি। আমি আপনাকে বিপথে চালিত না করলে, এতোদিনে কান্যকুব্জ ধ্বংস হত, আমার প্রভুর প্রাণ থাকত না।"

এই বিপদের সংবাদ জানাজানি হলে কুষাণসেনাদলে হাহাকার পড়ে গেল। মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে কীটপতঙ্গের মতো মরতে হবে, এ সম্ভাবনায় দুর্ধর্ষ কুষাণসেনা স্ত্রীলোকের মতো কাঁদতে লাগল। সম্রাট্ কণিষ্ক সৈন্যদের আশ্বস্ত করে কান্যকুব্জ-মন্ত্রীকে বললেন, "মন্ত্রী, তোমার প্রভুভক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। তোমার অদ্ভুত আত্মত্যাগে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তোমার তোমার চেষ্টা সফল হবে না; কারণ দেবতার পুত্র কণিষ্কের অগ্রগতি রোধ করতে পারে জগতে এমন কোনো শক্তি নেই। মরুভূমির

দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকেও অমি তুচ্ছ করে অগ্রসর হব। সুতরাং আমাকে প্রতারণা করার জন্য পূর্বে বৃথা যে অঙ্গগুলি ছেদন করেছিলে, আজ সেগুলির জন্য তোমার অনুতাপ করার দিন এসেছে।"

বিপদে কাতর না হয়ে সম্রাট্ কণিষ্ক তৎক্ষনাৎ অশ্বপৃষ্ঠে মরুমধ্যে জলের সন্ধানে বের হলেন। দৈবক্রমে ঘুরতে-ঘুরতে একস্থানে তিনি নিম্নভূমি দেখতে পেলেন। বোধ হল যেন সে স্থান খনন করলে জল উঠতে পারে। সম্রাট্ সেই স্থানে হস্থস্থিত কুন্ত (অর্থাৎ বর্শাবিশেষ) দ্বারা ভীষণ বলে আঘাত করলেন। অস্ত্রের অগ্রভাগ মৃত্তিকার নিম্নে বহুদূর প্রবেশ করল। সম্রাট্ লক্ষ্য করলেন, ছিদ্রপথে জলরেখা দেখা দিয়েছে। তখন সেনাদলে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। সম্রাট্‌কে সত্যসত্যই দেবানুগৃহীত মনে করে তারা কণিষ্কের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে কান্যকুব্জের মন্ত্রী করজোড়ে বললেন, "মহারাজ, ব্যর্থতার জন্য আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই। আমি যে নীতি প্রয়োগ করছিলাম, তা মানুষী শক্তিকে পরাভূত করার জন্য। কিন্তু আপনি দৈবশক্তির অধিকারী। আপনার বিরুদ্ধে আমার নীতি কার্যকরী হবে কিরূপে? এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি, আমার সেইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তবে আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আমার প্রভু কান্যকুব্জপতির অপরাধ নিজগুণে মার্জনক করুন।"

সম্রাট্ কান্যকুব্জ-মন্ত্রীর প্রভুহিতৈষিতা দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি হেসে বললেন, "আচ্ছা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। আমি এখান হতে পুরুষপুরে ফিরে যাব। কান্যকুব্জরাজ যে অপরাধ করেছেন, আমার ভাগ্যদেবতা তার শাস্তিবিধান করবেন।"

কুষাণসেনা মাটি খুঁড়ে জল সংগ্রহ করার পর রাজাধিরাজ কণিষ্ক সসৈন্যে মরুভূমি হতে বের হয়ে এসে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। কান্যকুব্জের রাজমন্ত্রীও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কথিত আছে যে, দৈবই কান্যকুব্জরাজকে শাস্তি দিয়েছিল। যেদিন সম্রাট্ কণিষ্ক

মরুভূমির মাটিতে কুন্তদ্বারা আঘাত করেন, শোনা যায়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ কান্যকুব্জরাজের হস্তপদ দেহ হতে স্খলিত হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

১। "এদিকে সসৈন্যে কণিষ্কের আগমন সংবাদে কান্যকুব্জ নগরে হাহাকার পড়ে গেল।"—কেন? তখন কি সিদ্ধান্ত নিলেন? মন্ত্রীর নাম কী? তিনি কি পরামর্শ দিলেন [৪+২+২+২]

২। "ঐ বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সম্রাট একটি রাজপরিচ্ছদ নির্মাণের সংকল্প করলেন।"—কোন বস্ত্রখণ্ড? সূচিক কেন রাজপরিচ্ছদ তৈরি করল না? সম্রাট কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন? [২+২+৬]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "প্রভু, ক্ষমা করুন। আমার প্রাণ গেলেও আমি এই বস্ত্রে আপনার পরিচ্ছদ তৈরি করতে পারব না।" কে কাকে এ কথা বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন? বস্ত্রটি কে পাঠিয়েছিলেন? [২+২+২]

২। কণিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? তাঁর রাজত্ব কতদূর ছিল? [২+৪]

৩। "মহারাজ, আপনি কালসর্পের পুচ্ছ দলিত করেছেন।"
কে কাকে একথা বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন? [২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কত খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দ আরম্ভ হয়? [৩]

২। কণিষ্ক কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? [৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। অর্থ লেখ—সূচিক, বিরাগ, পুচ্ছ, শিবির, অন্তর্ভুক্ত
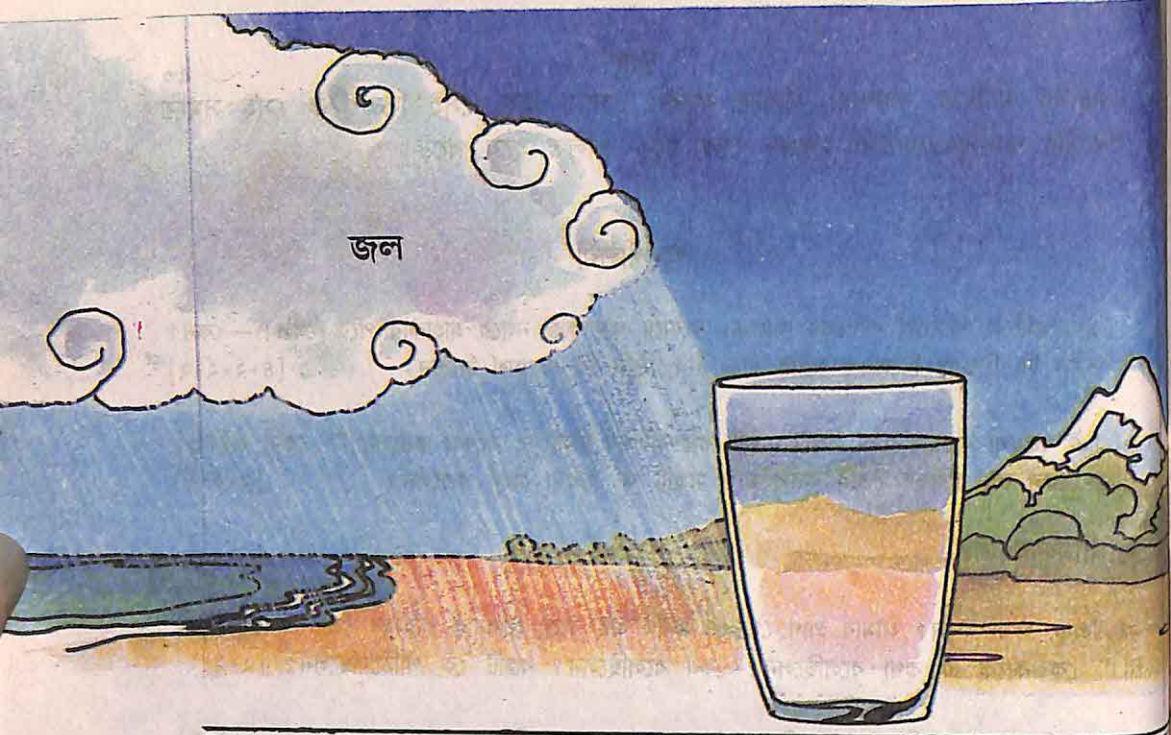
রাজশেখর বসু

ররচনা প্রসঙ্গে

রাজশেখর বসুর রচনা সমগ্র থেকে 'জল' প্রবন্ধটি গৃহীত। বিজ্ঞানের বিষয় সহজবোধ্য ভাষায় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যেও তিনি দুটি শাখাতে সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছেন। একটি হল গম্ভীর বিষয়, অপরটি লঘু হাস্যরসের। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি লঘু সাহিত্য রচনা করেন।

যতরকম খনিজ আছে তার মধ্যে জল মানুষের সবচেয়ে দরকারী, সেজন্য প্রথমেই আলোচ্য। জলের বিশাল ভাণ্ডার সমুদ্র, তা ছাড়া নদী হ্রদ প্রভৃতিও আছে। সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হয়ে জল বায়ুতে মিশে যায়, উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হয়, আবার বৃষ্টিরূপে নীচে ফিরে আসে। জলবাষ্পের কতক অংশ হিমালয়শিখরে বরফ হয়ে জমে, এবং গ্রীষ্মে সেই বরফ গ'লে সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির খাতে প্রবাহিত হয়। অনেক নদী উপনদীর উৎপত্তি শুধু বৃষ্টির জল থেকে, যেমন শোন নর্মদা গোদাবরী কাবেরী প্রভৃতি। বৃষ্টির এবং নদীবাহিত জলের কতকটা মাটিতে শোষিত হয়, কতকটা সমুদ্রে চলে যায়।

সমুদ্রজলে শতকরা প্রায় ৩১/২ ভাগ নানাজাতীয় লবণ আছে, তার মধ্যে সোডিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ সাধারণ নুনই বেশী। তার চেয়ে অনেক কম আছে ম্যাগনিশিয়াম পোটাসিয়ম ও ক্যালসিয়ম যুক্ত লবণ (ক্লোরাইড, সালফেট), আরও কম ক্যালসিয়ম কার্বনেট, লেশমাত্র ব্রোমাইড আয়োডাইড, এবং লেশের চেয়েও কম ফসফেট সিলিকা তামা সোনা রূপো। সমুদ্রজল থেকে নুন তৈরি অতি প্রাচীন শিল্প। অনেক দেশে ম্যাগনিশিয়ম ক্লোরাইডও উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় ব্রোমিন বার করা হচ্ছে, কিন্তু সোনা রূপো উদ্ধারের খরচ পোষায় নি। নদী হ্রদ প্রভৃতির জলও বিশুদ্ধ নয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে পুরাকালে সমুদেরর জলে এত লবণ ছিল না, ভূপৃষ্ঠস্থ শিলারাশির দ্রবণীয় অংশ বৃষ্টি আর নদীর জলে মিশে সমুদ্রে এসে বিবিধ লবণরূপে কোটি কোটি বৎসরে সঞ্চিত হয়েছে।

জল যখন বাষ্পাকারে ওঠে তখন তার লবণাদি নীচে পড়ে থাকে। বকযন্ত্রে পাতিত জল (distilled water) যেমন বিশুদ্ধ, বৃষ্টির জলও সেইরকম, কিন্তু পড়বার সময় বাতাসের ধুলো তার সঙ্গে মেশে। মধ্যবর্ষায় ধোয়া বাতাসে ধুলো খুব কম, সেজন্য তখনকার বৃষ্টির জল আরও নির্মল। বায়ুমণ্ডলে কিঞ্চিৎ অঙ্গারাম্ল বা কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, বৃষ্টির জলে তার কতকটা মিশে যায়। পরিমাণ কম হ'লেও ভূপৃষ্ঠস্থ বিবিধ খনিজদ্রব্যের উপর তার প্রভাব সামান্য নয়।

অনেক শিলার উপাদান ক্যালসিয়ম কার্বনেট। চুনেপাথর এবং খড়ি (চা খড়ি) তাতেই গঠিত। এই পদার্থ জলে গলে না, কিন্তু জলে অঙ্গারাম্ল থাকলে গলে। বৃষ্টির জলে অঙ্গারাম্ল থাকায় এই জাতীয় শিলার নিরন্তর ক্ষয় হচ্ছে এবং সেই দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম কার্বনেট নদীর জলে মিশে অবশেষে সমুদ্রে যাচ্ছে। সাধারণ মাটিতেও এই পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে আছে। খড়িতে কোনও অ্যাসিড (যেমন নেবুর রস) দিলে অঙ্গারাম্লের বুদ্‌বুদ্ বার হয়, মাটিতে দিলেও একটু হয়। মাটিতে যে ক্যালসিয়ম কার্বনেট থাকে তা আত্মসাৎ ক'রে বৃষ্টির জল ভূমির নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয়। মাটিতে যদি অন্য দ্রবণীয় উপাদান থাকে (সাধারণ লবণ, ম্যাগনিশিয়ম-যুক্ত লবণ, ইত্যাদি) তবে তাও সেই জলে

গৃহীত হয়। এইরকম ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিশিয়ম যুক্ত পদার্থ যে জলে বেশী তাকে বলা হয় খর জল (hard water), যাতে কম তার নাম মৃদু জল (soft water)। খর জলে সাবান ভাল গলে না, দই এর মতন গাদ পড়ায় কতক সাবান নষ্ট হয়, ডাল সহজে সিদ্ধ হয় না, জল ফোটালে কেতলি প্রভৃতি পাত্রের ভিতর শক্ত স্তর জমে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এবং কলকাতার কাছে অনেক কুয়োর জলে এই দোষ দেখা যায়। কলকাতার খালের জলে সমুদ্রজল আসে সে জন্য তা অত্যন্ত খর আর নোনা। চলিত কথায় খর জলকে ভারী বা বোদা জল এবং মৃদু জলকে হালকা বা মিঠে জল বলা হয়। দার্জিলিং-এর জল অত্যন্ত মৃদু, সেজন্য গায়ে সাবান মেখে জলে ধুলে হড়হড়ে ভাব সহজে যেতে চায় না।

খর জল ফোটালে যে গাদ পড়ে তার ফলে খরতা কতকটা কমে যায়। উপযুক্ত মাত্রায় চুন সোডা প্রভৃতির যোগে এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খর জলকে মৃদু করা যায়। অনেক কারখানায় বয়লার প্রভৃতির জন্য এই উপায়ে জলশোধন করা হয়। পানীয় জলের জন্যও অনেক স্থানে এই রকম ব্যবস্থা আছে।

গঙ্গা প্রভৃতি হিমালয়জাত নদীর জল মোটের উপর মৃদু। কলকাতার কলের জলেরও খরতা কম। মোহানার কাছে নদীতে সমুদ্রে জোয়ারের জল আসায় নুন এবং খরতা বাড়ে সেজন্য কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার জল বিস্বাদ। কলকাতার প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে পলতা নামক স্থানে গঙ্গা থেকে শহরের জন্য জল সংগ্রহ করা হয়।

মাটির আর একটি অতি সাধারণ উপাদান লোহা। এই লোহা অক্সিজেন-সংযোগে ফেরিক বা ফেরস অক্সাইড অঙ্গারাম্লযুক্ত জলে দ্রব হয়, কিন্তু ফেরিক অক্সাইড (বা হাইড্রক্সাইড) হয় না। বাংলা দেশের অনেক স্থানে পাতকুয়ো বা নলকূপের জল তোলবার সময় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু হাওয়া লাগলে উপরে সর পড়ে এবং তা থিতিয়ে লালচে বা হলদে গাদ হয়ে জমে। এই পরিবর্তনের কারণ—অঙ্গারাম্ল উবে যাওয়ায় ফেরস অক্সাইড অদ্রাব্য হয় এবং বায়ুর অক্সিজেন-যোগে তা ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। এইরকম জলে কাপড় কাচলে ক্রমশ তাতে গেরুয়া রং ধরে।

ভূমিতে যদি বালি নুড়ি কাঁকর প্রভৃতি বেশী থাকে তবে তার ভিতর দিয়ে সহজেই জল প্রবেশ করে এবং নীচে নামতে থাকে। এঁটেল মাটির স্তর এবং নিরেট পাথর অপ্রবেশ্য (impervious), তাদের ভিতরে জল যায় না । ভূমির নীচে যেখানে অপ্রবেশ্য স্তর থাকে সেইখানে জলের অধোগতি থামে এবং তার উপরে বালি প্রভৃতির প্রবেশ্য (pervious) স্তরে জল জমতে থাকে। এজন্য প্রবেশ্য স্তরের নীচে থেকে উপরে কতকটা দূর পর্যন্ত জলপূর্ণ বা সংপৃক্ত (saturated) হয়। বর্ষা শেষ হ'লে মাটি উপর থেকে শুখতে আরম্ভ করে, তার ফলে নীচে সঞ্চিত জলের উর্ধ্বসীমা বা খাড়াই ক্রমশ নামতে থাকে, এবং অনেক স্থানে গ্রীষ্মকালে একবারে লুপ্ত হয়। এরকম স্থানের কুয়োতে গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া যায় না। যেখানে মাটির নীচে সঞ্চিত জল

একবারে শুখিয়ে যায় না সেখানেও ইঁদারা পাতকুয়ো এবং নলকূপের গভীরতা সংপৃক্ত স্তরের যথাসম্ভব তলা পর্যন্ত হওয়া উচিত, নতুবা বার মাস জল না পাওয়া যেতে পারে।

যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম এবং বালি প্রভৃতির স্তর উপর থেকে অনেক নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে সেখানে খুব গভীর কুয়ো করতে হয়। নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানে, যেমন কলকাতার আশেপাশে, মাটির ৩।৪ হাত নীচেই জল পাওয়া যায়, এবং গ্রীষ্মকালেও তা খুব নীচে নামে না। তার কারণ—এইসব স্থানে বৃষ্টি বেশী, এবং প্রবেশ্য স্তরও খুব গভীর নয়, অনেক জায়গায় ৫০।৬০ ফুট নীচেই অপ্রবেশ্য এঁটেল মাটির স্তর । কিন্তু অপ্রবেশ্য স্তরের নীচেও আবার প্রবেশ্য স্তর পাওয়া যায় এবং তাতেও দূরবর্তী স্থান থেকে জল এসে জমা হয়। বাংলা দেশের অনেক স্থানে এবং অন্য প্রদেশেও পর্যায়ক্রমে প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য স্তরের বিন্যাস দেখা যায়, এবং সব প্রবেশ্য স্তরের জলও সমান নয়। উপরের জল সাধারণত মৃদু, কিন্তু জীবাণুদুষ্ট। তার নীচের জল জীবাণুশূন্য কিন্তু খর আর নোনা হতে পারে। আরও নীচের জল হয়তো নির্দোষ। নলকূপ বসাবার সময় উপযুক্ত স্তর নির্বাচন একটি কঠিন কাজ। নদীর জলের চেয়ে কুয়ো এবং নলকূপের জল সাধারণত খর।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। মানুষের সবচেয়ে দরকারী খনিজ কি? জলের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার কোথায়? সমুদ্রের জলের এরূপ স্বাদের কারণ কি? [২+২+২+৪]

২। খর জল কাকে বলে? মৃদু জল কাকে বলে? খর জলের দোষ কি? খর জলকে কি কি উর্পায়ে মৃদু জল করা যায়? [২+২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। সমুদ্রের জলে কি কি খনিজ মেশানো আছে? এইসব খনিজের মধ্যে কোন্ কোন্ খনিজ উদ্ধার করা যায়? সমুদ্রের জলে এত লবণ কিভাবে সঞ্চিত আছে? [৩+৩+৪]

২। "কলকাতার আশেপাশে মাটির ৩।৪ হাত নীচেই জল পাওয়া যায়"। কেন ৩।৪ হাত নীচে জল পাওয়া যায়? প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য স্তর কাকে বলে? উপরের জল ও নীচের জলের পার্থক্য কি? [৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বরফগলা জল থেকে কোন্ কোন্ নদীর উৎপত্তি? বৃষ্টির জল থেকে কোন্ কোন্ নদীর উৎপত্তি? বৃষ্টি ও নদীর জল শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়? [১+১+১]

২। বৃষ্টির জল পড়বার সময় তার সঙ্গে কি মেশে? খর জল ফোটালে কি হয়? দার্জিলিংয়ের জল কেমন? [১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

বিপরীত শব্দ লেখ: খর, বিশুদ্ধ, দ্রবণীয়, অপ্রবেশ্য, উর্ধ্ব, গভীর, নির্মল।
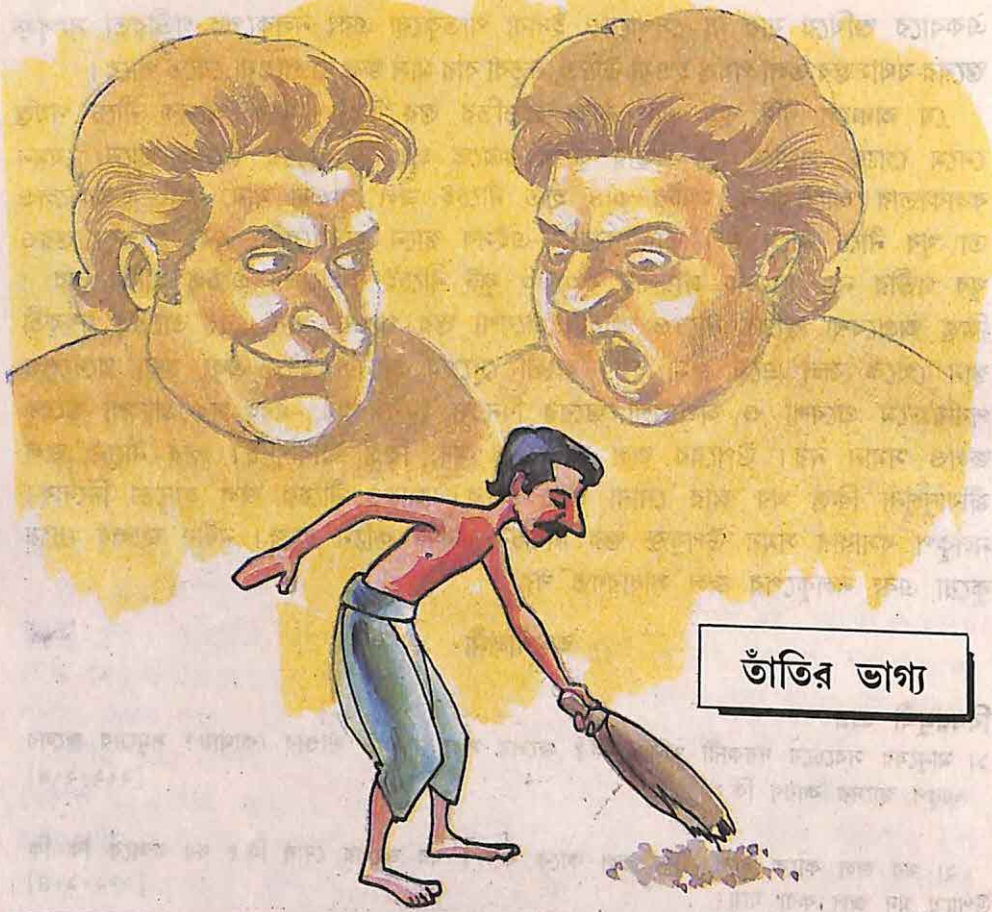
তাঁতির ভাগ্য

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

রচনা প্রসঙ্গে

বিভূতিভূষণ গুপ্ত রচিত 'বেড়াল ঠাকুরঝি' নামক গ্রন্থ থেকে 'তাঁতির ভাগ্য' গল্পটি উদ্‌ধৃত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত 'বেড়াল ঠাকুরঝি' বইটিতে এরূপ আরো অনেক মজার মজার গল্প আছে।

উদ্যোগী-পুরুষ আর অদৃষ্ট-পুরুষ একদিন পাশাপাশি চলেচেন। যেতে যেতে দেখেন কি, এক কুঁড়েঘরে এক তাঁতি থাকে; বেচারি বড্ড গরিব, অনেকগুলি তার পুষ্যি। এখন একখানি মোটে তার তাঁত, তাইতেই সে কাপড় বোনে, যা পায় তাতে তার কিছুতেই

কুলোয় না। উদ্যোগী-পুরুষ তাই দেখে বললেন অদৃষ্টকে—ওহে, তাঁতি যে বড়ো কষ্ট পাচ্চে, তা ওকে একটুখানি বড়ো করে দেওয়া যাক-না।

অদৃষ্ট বললেন—চলো।

উদ্যোগী-পুরুষ হেসে বললেন—না, তোমার আর যেতে হবে না, আমি একলাই তাঁতিকে বড়ো করে দেব।

এই কথা শুনে অদৃষ্ট-পুরুষের হল রাগ। তিনি বললেন—তোমার তো বড়ো অহংকার হয়েচে। আচ্ছা, যাও দিকিনি, তাঁতিকে কেমন করে বড়োলোক করে দিয়ে এস দেখব।

উদ্যোগী-পুরুষ করেচেন কী, রাত্তির হতে তাঁতির তাঁতগড়াতে একছড়া মানিকের হার ফেলে দিয়ে এলেন।

এখন, ওই তাঁতি হল রাতকানা। সে ঝাঁটপাট দিয়ে, জঞ্জাল কোণেতে জড়ো করে রেখে কাঁথা পেতে শুয়ে আছে।
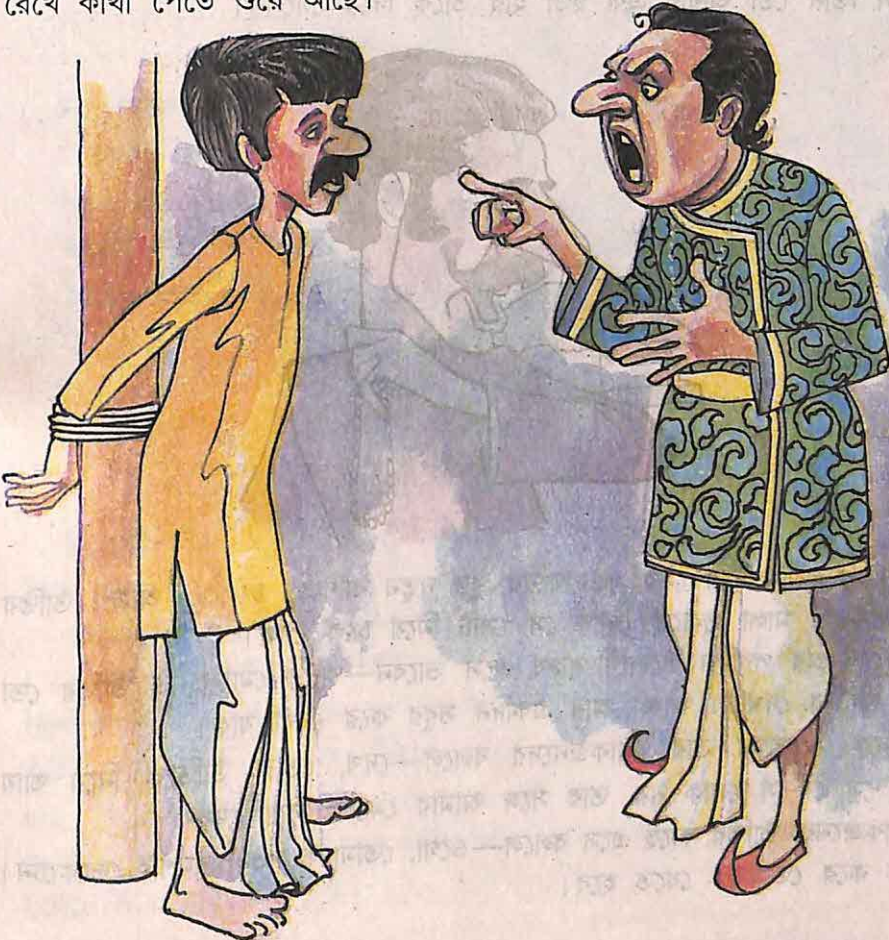
এদিকে সেই পথ দিয়ে এক সওদাগরের পুত্র বাণিজ্য করে ফিরচে। সে এতবড়ো সওদাগর যে, রাজার তুল্য। সে তার লোকজনদের ডেকে বললে—দেখ্ তো তোরা তাঁতির কুঁড়েঘরে কিসের আলো জ্বলচে।

বলতেই ওরা সব দেখে এসে বললে—মহাশয়, মানিকের মালা জ্বলচে।

কুঁড়েঘরে ?

না —হাঁ।

তাই শুনে সওদাগর বললে—নিয়ে আয় বার করে। এই কথায় সওদাগরের লোক এসে তাঁতির মানিকের মালাটি চুরি করে নিয়ে গেল।

এখন, তার পরদিন উদ্যোগী-পুরুষ তাঁতির ঘরে গিয়ে ভাবলেন—কাল যে আমি একে মানিক দিয়ে গেলাম, কই এখনও তো এ বড়োলোক হল না। তাই তো! আচ্ছা, আর এক ছড়া হার দিয়ে যাই।

ব'লে তিনি তো আবার এক ছড়া হার তাকে দিয়ে গেলেন।
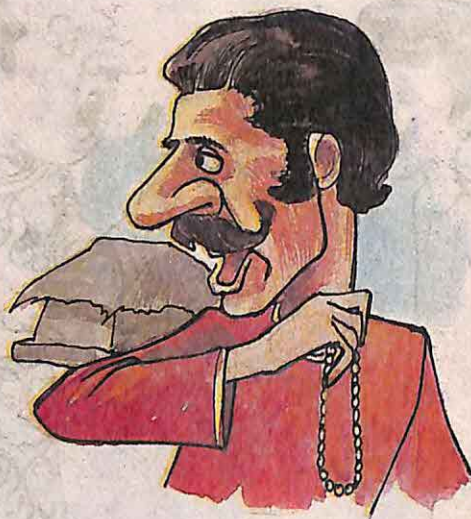
এখন সেইখান দিয়ে সেই সওদাগরের পুত্র নতুন বাণিজ্যে চলেচে। আজও তাঁতির ঘরে মানিকের মালা জ্বলতে দেখে সে সেটি নিয়ে চলে গেল।

এদিকে তার পরদিন উদ্যোগী-পুরুষ এসে ভাবেন—আরে মোলো, এ তাঁতির তো কিছুই হল না দেখচি! আচ্ছা আর একদিন সবুর করে দেখা যাক।

এদিকে সওদাগর তার লোকজনদের বললে—দেখ, তোরা তাঁতিকে নিয়ে আয় গিয়ে। সে যে-সে লোক নয়, তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

লোকজনেরা তাঁতির কাছে এসে বললে—ওগো, তোমাকে সওদাগরমশাই ডেকেচেন। পালকি করে তোমাকে যেতে হবে।

তাঁতি তো ভয়ে আড়ষ্ট! বললে— মশাই, আমি তো কিছু করি নি। তবে আমাকে কেন ডেকেচেন?

লোকেরা বললে—তা তো আমরা বলতে পারি না। তুমি চলো।

এই বলে তারা তাঁতিকে নিয়ে গেল।

নিয়ে যেতেই সওদাগরের হুকুমে দাসদাসীরা তাকে বেশ করে সাবান-টাবান দিয়ে ধুইয়ে নাইয়ে পরিষ্কার করলে। তাঁতি বললে—কেন মশাই, আপনার কি দিঘিতে জল ওঠে নি? আমার মুণ্ডু কেটে কি সেইখানে দেবেন?

সওদাগর বললে—না।

তবে কি—

না—আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। তখন খুব ধুমধাম করে তাঁতির সঙ্গে সওদাগরের মেয়ের বিয়ে হল।

উদ্যোগী-পুরুষ অদৃষ্টকে গিয়ে বললেন—ওহে, তাঁতিকে যে রাজার জামাই করে দিয়ে এলাম।

অদৃষ্ট-পুরুষ বললেন—বেশ করেচ।

এদিকে এখন হয়েচে কী, তাঁতি বড়োলোক বলে সওদাগর হুকুম দিয়ে তার বাসরঘর বেশ ভালো করে সাজিয়েচে। কত ঝাড়লণ্ঠন, কত ফুলের মালা, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁতি কিন্তু রাতকানা। উঠতে যায়, আর পায়ে লেগে আলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সওদাগরের মেয়ে তাই দেখে চটে লাল। সে বাসরঘর থেকে উঠে এসে সকলকে বললে—দেখো গে যাও তোমাদের জামাইয়ের কাণ্ড! কত টাকার যে লোকসান করেচে তার আর ঠিক নেই।

লোকেরা তাই-না দেখে দৌড়ে গিয়ে সওদাগরকে খবর দিলে। সওদাগর এসে দেখে ঝাড়লণ্ঠন সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েচে। তখন সওদাগর বললে—অমন জামাইয়ের দরকার নেই। ওর গর্দান নাও।

বলতে না বলতেই লোকজন এসে তাঁতির হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে তাকে মশানে নিয়ে চলল।

এদিকে অদৃষ্ট-পুরুষ তাই দেখে উদ্যোগী-পুরুষকে গিয়ে বললেন— ওহে, তাঁতি যে মরে!

উদ্যোগী-পুরুষ বললেন—মরে কী? আমি যে তাকে রাজার জামাই করে দিয়ে এসেচি। আজ বাদে কাল সে তো সিংহাসনে বসবে।

অদৃষ্ট-পুরুষ বললেন—বসবে তো বসবে, এখন একবার দেখেই এসো না।

উদ্যোগী-পুরুষ সব দেখে শুনে বললেন—আরে মোলো, এত করে খেটে মরলাম,

কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না!

উদ্যোগী-পুরুষ ফিরে আসতে অদৃষ্ট বললেন—কী হে, দেখে এলে?

না—হ্যাঁ।

তোমার আর কোনো ক্ষমতা নেই তো?

উদ্যোগী-পুরুষ চুপ।

তবে দেখো, এবার আমি যাই। গিয়ে তাঁতিকে বড়ো করে আসি।

না—আচ্ছা।

এখন অদৃষ্ট-পুরুষ তাঁতির কপালে গিয়ে বসলেন।

এদিকে সওদাগর জিজ্ঞাসা করচে—বলো, তুমি আলো কেন ভেঙেচ? তাঁতির হঠাৎ কী বুদ্ধি হল, বললে—আমি অত গরম সহ্য করতে পারি নে।

তখন সওদাগর বললে—ওহো, আমারই ভুল হয়েচে। যে থাকে মানিকের আলোয়, ঝাড়লণ্ঠনের তাপ সে সহ্য করতে পারবে কেন?

তখন সওদাগর নিজে এসে তাঁতির হাতের হাতকড়ি খুলে দিলে। দিয়ে রাজমুকুট মাথায় পরিয়ে তাঁতিকে সিংহাসনের উপর বসিয়ে দিলে।

অদৃষ্ট-পুরুষ গিয়ে উদ্যোগী-পুরুষকে বললেন—দেখো গে, তাঁতিকে আমি বড়োলোক করে দিয়ে এলাম।

উদ্যোগী-পুরুষ গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো, তাঁতি দিব্যি ক'রে সিংহাসনে বসে আছে।

অদৃষ্ট-পুরুষ তখন বললেন—ওহে, আমি না চাইলে শুধু উদ্যোগে কিছু হয় না।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। তাঁতির অবস্থা কেমন ছিল? উদ্যোগী-পুরুষ তাঁতির অবস্থা দেখে কি বললেন? তিনি তাঁতির অবস্থা ফেরাতে কী করলেন? তাঁতির মালাটি দেখে সওদাগরের পুত্র কি করল? [২+২+২+৪]

২। তাঁতি আলো ভেঙেছিল কেন? সওদাগর শুনে কি বলল? অদৃষ্ট-পুরুষ কিভাবে তাঁতিকে বাঁচান? [২+২+৬]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "না, তোমার ..... বড়ো করে দেব।"
কে এই কথা বললেন? এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গীর মনের ভাব কী হল? তিনি কি বললেন? [৩+৩+৪]

২। "ওহে, তাঁতি যে মরে!"
কে কাকে এই কথা বললেন? এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গী কি বললেন? সব দেখে শুনে তিনি কি বললেন? তাঁতিকে শেষ পর্যন্ত কে বড়ো করে দিলেন? [২+২+২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। তাঁতির কতগুলি পুষ্যি ছিল? তাঁতি কোথায় আসত? তাঁতির কটি তাঁত ছিল? [১+১+১]

২। তাঁতির কার সঙ্গে বিয়ে হল? তাঁতিকে নিয়ে যাওয়ার পর দাসদাসীরা কী করল? তাঁতি তাদের কি বলল? [১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

শব্দার্থ লেখ: উদ্যোগী, অদৃষ্ট, রাতকানা, জঞ্জাল, ঝাড়লণ্ঠন, মশান।
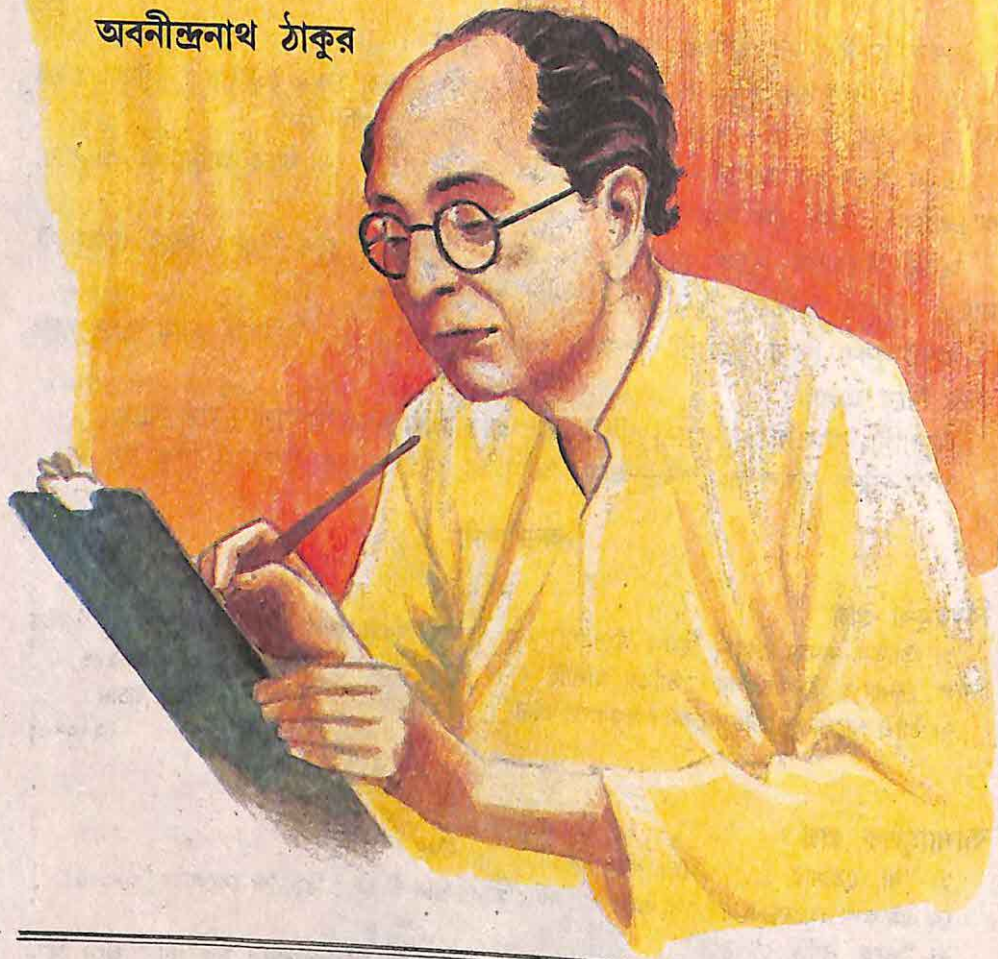
রচনা প্রসঙ্গে ___ সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'ময়ূরকণ্ঠী' গ্রন্থ থেকে রচনাটি' গৃহীত। রচনাটিতে অবনীন্দ্রনাথের প্রতি মুজতবা আলীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত। ইনি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন, আবার কিছুদিন ওখানে অধ্যাপনাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল এঁর গভীর শ্রদ্ধা।

আমি তখন ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স! বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু-ঘন্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন ?

সত্যই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান

ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা—কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন রঙ পাবেন কোথায় তখন দেখি, ভানুমতী দিয়ে তিনি যেন আরো নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

আর কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সুখদুঃখ, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোঁটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্রদীপ।

* * *

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ,

নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগন তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনের আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিনই তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনি নি—আমার মনে হয়, দেবদূতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন—সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জারণ করে উঠেছিল।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি—অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, 'জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক—আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙার ওপারে, ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনে বলেন, 'মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!'

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম, বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।'১

সে যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস আশা করি, একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

* * * * * *

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন অটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম আমার অটোগ্রাফে কিছু এঁকে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরী ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি এঁকে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে 'বর্ষামঙ্গল' করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।'

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, 'তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?'

আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।'

বললেন, 'দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি, আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।'

বলে লিখলেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ॥১

অনুশীলনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। লেখকের কত বৎসর বয়সে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়? লেখক তখন কী করতেন? অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের পরিচয় কে করিয়ে দিলেন? সাক্ষাতের পর অবনীন্দ্রনাথ লেখককে কী বললেন? [২+২+২+৪]

২। শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথকে কে অভ্যর্থনা করলেন? কোথায় অভ্যর্থনা করলেন? সঙ্গে আর কারা কারা ছিলেন? [২+২+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "আর সেদিন ....কখনো শুনিনি"। কি প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের সেদিনের ভাষা শুনে লেখকের কী মনে হয়েছিল? [৪+৬]

২। "তখন আমাদের সবাইকে ...... স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়।" কে এই কথা বললেন? কাকে বললেন? কার কী কথায় রঙীন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল? [২+২+৬]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নন্দলাল বসু কে। তিনি কার শিষ্য [২+২]

২। গগনেন্দ্রনাথ কে? অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? [২+২]

অর্থ লেখ: নবজাগরণ, সোৎসাহে, গোড়াপত্তন, সর্বাঙ্গসুন্দর, প্রদীপ্ত, নির্বাপিত, বাতায়ন, গুঞ্জরণ, অটোগ্রাফ।

বংশ গৌরব

বনফুল

রচনা প্রসঙ্গে

'বংশ গৌরব' গল্পটি বনফুল রচনা থেকে সংগৃহীত। অল্প পরিসরে তিনি অসাধারণ ছোট গল্পের স্রষ্টা। এই গল্পের নায়ক তাঁর পূর্ব পুরুষ কিরকম সাহসী ছিলেন তার বর্ণনা দেওয়ার পরই অফিসের সাহেবের ভয়ে কাঁপছেন। এটি একটি ব্যঙ্গধর্মী রচনা।

"জমিদার সূর্য চৌধুরীর কথা এখনও লোকে ভোলেনি, বুঝলে? শোন তবে একটা গল্প বলি। গল্প নয় —সত্যি কথা। নিজের চোখে দেখি নি— বাবার মুখে শুনেছি।

সবে তখন সিঙ্গাপুর জমিদারিটা কেনা হয়েছে। আসল জমিদার যিনি ছিলেন তিনি ত টাকা কড়ি নিয়ে চম্পট দিলেন বিলেতে। তিনি ছিলেন নীলকর সাহেব। তখন নীলকর সাহেবরা চাঁটি-বাটি গুটিয়ে সব স'রে পড়েছেন। আসল জমিদার টম সাহেব চলে' গেলেন— কিন্তু তাঁর ম্যানেজার লং সাহেব আর নড়তে চায় না। সে ব্যাটা কুঠি দখল করে ব'সে রইল। তাঁকে খবর পাঠানো হলো।

ব্যাটা কি বল্লে জান?

বল্লে 'আমার ছ'মাসের মাইনে ছ'হাজার টাকা বাকী আছে। আমার মালিক টাকাটা তোমাদের কাছে নিয়ে নিতে বলেছে। টাকাটা পেলেই আমি চলে' যাব। জমিদারি
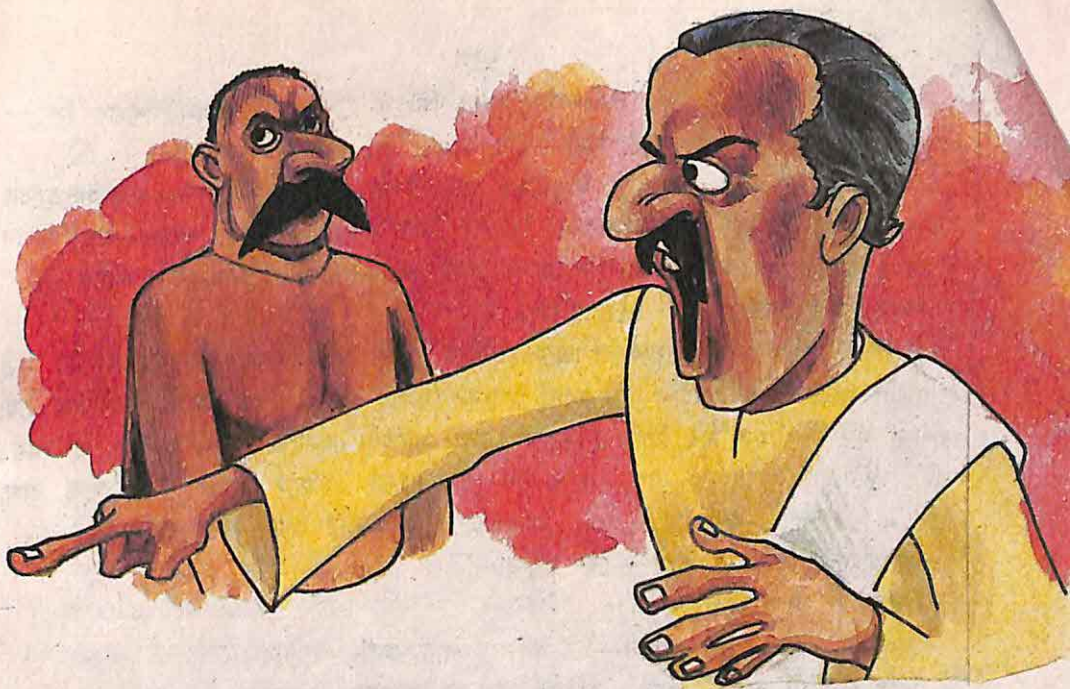
কেনার সময় একটা শর্ত ছিল যে, ম্যানেজারের বাকী মাইনেটাও দিয়ে দিতে হবে।'

সর্বৈব মিথ্যে কথা—বুঝলে?

ব্যাটা এক জাল ডকুমেন্টও বার করলে।

সকলের চক্ষু স্থির।

সূর্য চৌধুরী কিন্তু দমবার ছেলে নয়, তাঁর তখন চারটে হাতি, চোদ্দটা ঘোড়া—শতখানেক পালোয়ান বরকন্দাজ। প্রবল প্রতাপ—বুঝলে?

তিনি ইচ্ছে করলে সেই দিনই ব্যাটাকে মেরে গ্রাম ছাড়া করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সেদিন মেজাজটা খুব ভাল ছিল। সেইদিনই তাঁর নাতি হয়েছে—অর্থাৎ শর্মা সেদিন জন্মগ্রহণ করেছে—"

বলিয়া বক্তা নিজের বক্ষঃস্থলে আঙুল দিয়া টোকা দিলেন।

"তাই সেদিন তিনি আর মার-ধোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে গেলেন না। ম্যানেজার বেহারীবাবুকে ডেকে বল্লেন 'ওহে, একটা কোন ফন্দি ক'রে লোকটাকে তাড়াতে হবে। এক কাজ কর ব্যাটারা শুনেছি চা না খেলে টিকতে পারে না। এক কাজ কর— চা যাতে না খেতে পায় তার একটা ব্যবস্থা কর। বেশি কিছু করতে হবে না—গ্রামের সব গয়লাকে আজকে ডাকিয়ে আনাও—সকলকে—'

ম্যানেজারবাবু গয়লাদের ডাকবার বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজারবাবু

চলে' গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শঙ্কর সিংকে ডেকে পাঠালেন। শঙ্কর সিং—দুর্ধর্ষ জোয়ান, লম্বা প্রায় সাত ফিট—ইয়া বুকের ছাতি—ইয়া গলাপাট্টা।

শঙ্কর সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই তার উপর হুকুম হয়ে গেল—লং সাহেবের যত গরু মহিষ আছে—সব রাতারাতি হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশক্রোশ দূরে—আমেদাবাদ খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো। কাল সকালে সাহেবের গোয়ালে যেন একটি গরু মহিষ না থাকে—

শঙ্কর সিং সেলাম করে চলে গেল।

বিকেল নাগাদ সব গোয়ালারা এসে পৌঁছে গেল আশপাশের দশখানা গ্রামের যত গোয়ালা ছিল—সব হাজির। ঠাকুরদা তাদের উপর কড়া হুকুম জারি করলেন যে, তাদের যত দুধ হয় সব তিনি কিনবেন—লং সাহেব যেন এক ফোঁটা দুধ না পায়; যদি কেউ লং সাহেবকে এক ফোঁটা দুধ বিক্রি করে তা'হলে তাকে আর আস্ত রাখা হবে না। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে জুতো মেরে তাকে জমিদারি ছাড়া করা হবে।

গোয়ালারা সমস্বরে বল্লে—'যো হুকুম—'

গোয়ালার দল চলে' গেল।

ঠাকুরদা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—'চা খাওয়া বার করছি ব্যাটার—'

তার পরদিন লং সাহেবের কুঠিতে হুলুস্থূল ব্যাপার। খানসামা এসে সেলাম ক'রে জানালে—'হুজুর দুধ কাঁহু নেই মিলত' শুনে লং সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে গেল।

মেমসাহেব স্তম্ভিত।

মেমসাহেব ভীতু লোক ছিলেন। তিনি সাহেবকে অনুরোধ করতে লাগলেন—'মিষ্টার চৌধুরী শুনেছি ভয়ানক লোক। ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ঠিক নয়—'

লং সাহেবের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ।

বল্লেন—'ইউ কিপ কোয়ায়েট।'

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গেলেন থানায়।

জমিদার সূর্য চৌধুরীর নামে গরু-চুরির নালিশ করতে। গিয়ে দেখেন থানায় দারোগা নেই—সেইদিন ভোরেই দারোগা সাহেব মফঃস্বলে 'টুরে' বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা জমাদার সাহেব বলতে পারলেন না।

দারোগা সাহেব ঠাকুরদার মহা-ভক্ত ছিলেন।

না হবেনই বা কেন?

তখনকার দিনে এমন কোন অফিসার ও'অঞ্চলে ছিলেন না যিনি ঠাকুরদার দই, দুধ, ক্ষীর, ঘি, মাছ না খেয়েছেন। আর তা-ও কি একটু আধটু। মণ মণ।

যাক—লংসাহেব ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিনা দুধেই খানিকটা চা গলাধঃকরণ করলেন। বেচারা!

তার পরদিন কিন্তু এক কাণ্ড ঘটল!

কে একজন এসে ঠাকুরদাকে খবর দিলে যে সাহেব দুধ পেয়েছে।

সে কি? কে দুধ দিলে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে!

তখ্‌খুনি চর ছুটল সঠিক সংবাদ আনবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে চা এসে খবর দিলে—সে খানসামার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে—সাহেব শহর থেকে টিনের দুধ আনিয়েছেন, টিন ছ্যাঁদা করে তার থেকে দুধ বের করে চায়ের সঙ্গে গুলে খাচ্ছে!

ঠাকুরদা বল্লেন— 'টিনের দুধ? সে কি?'

তখনও কনডেন্সড্ মিল্কের চলন হয়নি—বুঝলে?

ঠাকুরদা ত আকাশ থেকে পড়লেন। টিনের দুধ? বলে কি!

যাই হোক সূর্য চৌধুরী দমবার ছেলে নয়।

বজ্র-নির্ঘোষে হাঁক ছাড়লেন—শঙ্কর সিং—

শঙ্কর সিং এসে হাজির হল।

ঠাকুরদা হুকুম দিলেন লং-সাহেব কুঠিতে বসে এক টিনের দুধ দিয়ে চা খাচ্ছে—এক্ষুনি গিয়ে সেই টিন কেড়ে নিয়ে এসো। যাও—

শঙ্কর সিং বেরিয়ে গেল।

পুরো চব্বিশটি ঘন্টা সাহেব ভাল করে চা খেতে পায়নি। অবস্থাটা বোঝ একবার—প্রাণ একেবারে খাঁ খাঁ করছিল। টিনের দুধ শহর থেকে আনিয়ে বেশ বাগিয়ে স্বামী স্ত্রী বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে! সকাল বেলা।

চায়ের টেবিলের ঠিক সামনেই—কাচের দরজা বন্ধ। চা খাওয়া চলছে, এমনসময় প্রকাণ্ড এক ঘোড়ায় চড়ে—টগবগ টগবগ করতে করতে শঙ্কর সিং এসে হাজির—হাতে
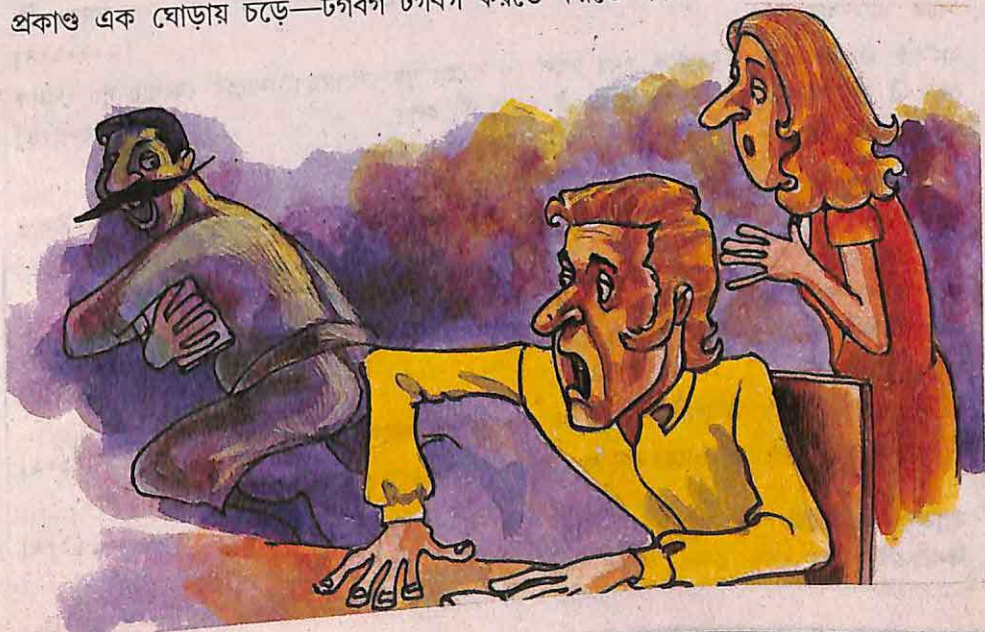
প্রকাণ্ড বর্শা। তড়াক করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে শঙ্কর সিং সোজা সেই কাচের দরজার সামনে এসে হাজির হ'ল।

এসেই এক লাথি।

ঝনঝন করে দরজা ভেঙে পড়ল।

বিদ্যুদ্বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুধের টিন নিয়ে আবার বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গিয়ে শঙ্কর সিং ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেব হতভম্ব।

মেমসাহেব মূর্চ্ছিত।

"সেই দিনই সাহেব তল্পি-তল্পা গুটিয়ে—"

এমন সময় বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘন্টা বাজিয়া উঠিল।

'ঘন্টা বেজে গেল নাকি? আর নয় ভাই আমাদের সাহেব ব্যাটা ভয়ানক স্ট্রিক্ট! একটু দেরী হলেই 'ফাইন' করে—'

এই বলিয়া বক্তা ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি অফিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের পৌত্র চরণ বাবু— বর্তমানে সদাগরি অফিসে কেরাণীগিরি করেন।

খাসা গল্প বলিতে পারেন ভদ্রলোক।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সূর্য চৌধুরী কে ছিলেন? তিনি কার জমিদারী কিনেছিলেন? শঙ্কর সিং কে? লং সাহেব কি খেতে ভালোবাসতেন? [২+২+২+৪]

২। "কে একজন এসে ঠাকুরদাকে খবর দিলে যে সাহেব দুধ পেয়েছে।" সাহেব কোথায় দুধ পেল? কেন ঐ দুধ আনতে হল? শেষ পর্যন্ত ঐ দুধের কী হল? [৩+৩+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। গোয়ালারা সমস্বরে বলল, "যো হুকুম—" কাকে গোয়ালারা এ কথা বলল! কিসের উত্তরে একথা বলল? কেন এ ব্যবস্থা নেওয়া হল? [২+৪+৪]

২। "তাই সেদিন ...... দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে গেলেন না"।
বক্তা কে? বক্তার সঙ্গে জমিদারের কী সম্পর্ক?
দাঙ্গা-হাঙ্গামায় না গিয়ে কী ফন্দি করলেন? [২+২+৬]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সূর্য চৌধুরী কোন্ জমিদারি কিনেছিলেন? জমিদারির আগের মালিক কে ছিলেন? [১+২]

২। আগের জমিদারের ম্যানেজারের নাম কি? আসল জমিদার চলে চাওয়ার পর সেও কি চলে গেল? [১+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ: কেনা, আসল, মিথ্যা, ভীতু পৌত্র।
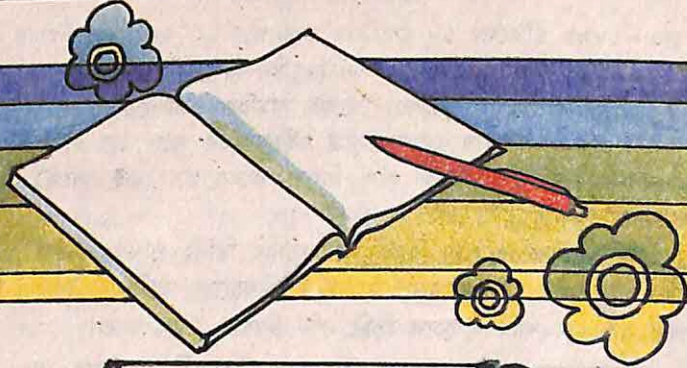
লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে কলকাতায় জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান বা অষ্টম পুত্র। স্কুলের পড়ায় মন না বসায় বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়। তিনি শৈশবকাল থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। এই রচনার ধারা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান, চিঠিপত্র ইত্যাদি সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর অজস্র রচনা বিদ্যমান। বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টাও রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। জীবনের শেষ পর্যায়ে চিত্র রচনাতে মন দেন এবং সেগুলি দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ আগস্ট রাখী পূর্ণিমার দিন তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী— ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার মনুয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কালীনাথ রায়। পরে খুল্লতাত হরিকিশোর রায়চৌধুরীর দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সখা' পত্রিকাতে তিনি প্রথম রচনা প্রকাশ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ছেলেমেয়েদের জন্য 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা শিশু সাহিত্যে যুগান্তর এনে দেয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'টুনটুনির বই', 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন' ইত্যাদি বিশেষ বিখ্যাত। এদেশে ছবি ছাপার ব্যাপারেও তিনি পথ প্রদর্শক।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিডিতে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়— চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম হয়। পিতার নাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সাংসারিক অসচ্ছলতার দরুন কিশোর বয়সেই তাঁকে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। প্রথমে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর কটক জেলায় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। পরে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিউজিয়ামের কিউরেটার-এর কাজ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা সাহিত্যে তিনি উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক রূপে বিখ্যাত। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'কঙ্কাবতী' 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ডমরু চরিত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লেখক পরিচিতি

জগদানন্দ রায়—১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরে জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়। স্কুল এবং কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কিছুদিন মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল। ছাত্রাবস্থা থেকেই সামরিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় লেখার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন এবং এই কাজেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেন।

সহজ বাংলায় জন সাধারণের জন্য বিজ্ঞান আলোচনায় তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর রাচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'গ্রহনক্ষত্র', 'গাছপালা', 'পোকামাকড়', 'আচার্য জগদীশচন্দ্রেব আবিষ্কার' ইত্যাদি বিশেষ বিখ্যাত। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুন শান্তিনিকেতনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারিপুর গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দে বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ও পরবর্তী খণ্ড 'অপরাজিত' লেখকের সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর রচিত 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হয়।

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের মৃত্যু হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর —১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাকোয় জন্ম। পিতার নাম গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতারূপে তিনি শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত। সাহিত্যকর্মেও তাঁর খ্যাতি অনুরূপ। তাঁর লিখিত 'আপন কথা', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া', 'পথে বিপথে', 'রাজকাহিনী' ইত্যাদি গ্রন্থ পড়লে জানা যায় যে লেখক হিসাবে তাঁর মহিমা অসামান্য।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ১৮৭৬ সালে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ভাগলপুর থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন, কিন্তু অর্থাভাবে আর বেশি পড়া সম্ভব হয়নি। চাকরিসূত্রে কিছুদিন ব্রহ্মদেশে ছিলেন।

সাহিত্যরচনার হাতেঘড়ি কিশোর বয়সেই হয়। চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এসে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। রচিত গ্রন্থর মধ্যে 'শ্রীকান্ত' চার খণ্ড, 'দত্তা', 'দেবদাস', 'পথের দাবী' ইত্যাদি অজস্র গল্প, উপন্যাস ও কিশোর কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ সালে এই মহান সাহিত্যিকের দেহাবসান হয়।

লেখক পরিচিতি

দীনেশচন্দ্র সরকার—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর সরকার। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। পরে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, পি. এইচ. ডি. এবং মুআট্‌ স্বর্ণপদক পান।

কর্মজীবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করেন এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি-অধ্যাপক রূপে অধ্যাপনা করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৩টি এবং প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।

এই জ্ঞান তপস্বী তাঁর গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের জন্যও সহজ ভাষায় ইতিহাসের গল্প লিখে গেছেন।

১৯৮৫ সালে তাঁর দেহাবসান হয়।

রাজশেখর বসু— বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরের জন্ম হয়। পিতা চন্দ্রশেখর কর্মব্যপদেশে বিহার প্রাবাসী ছিলেন। রাজশেখর দ্বারভাঙা কলেজ থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে এসে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে রাসায়নিকের পদ গ্রহণ করেন এবং পরে ওখানকার সর্বময় কর্তা হন।

তিনি গুরুগম্ভীর এবং হালকা— উভয় রসের সাহিত্য রচনায়ই পারদর্শী ছিলেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'চলন্তিকা অভিধান', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রচিত তাঁর ব্যঙ্গ রচনাগুলি কালজয়ী সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত। এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গড্ডালিকা' ইত্যাদি বিশেষ খ্যাত।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরের মৃত্যু হয়।

লেখক পরিচিতি

বিভূতিভূষণ গুপ্ত — (১৮৯৯?-১৯৭০) এঁর আদি নিবাস হুগলী জেলা। ছাত্রজীবনে প্রবেশিকা পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে এবং উচ্চতর শিক্ষা কলিকাতায়। ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতন পাঠভবনে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। মাঝে কিছুকাল কলিকাতায় 'শান্তিভবন' নামে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৪-৪৮ এবং ১৯৬০-৬২ সালে শান্তিনিকেতন পাঠভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন।

ছোটদের জন্য তিনি দুটি পুস্তক রচনা করেন — বেড়াল ঠাকুরঝি এবং কাঠবেড়ালি ভাই। প্রথমোক্তটির ভূমিকা লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ ছাড়া সাময়িক পত্রিকাতেও তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়।

১৯৭০ সালের ১৫ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

সৈয়দ মুজতবা আলী— ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিলেটের করিমগঞ্জ শহরে মুজতবা আলীর জন্ম হয়। পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী। ছাত্রজীবনেই তাঁর সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। শিক্ষাজীবনে প্রথমে শান্তিনিকেতন, পরে জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ, আকাশবাণীর কেন্দ্রীয় অধিকর্তা এবং বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

মুজতবা আলী ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'দেশে বিদেশে', 'চাচা কাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি রচনা বিশেষ বিখ্যাত।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়াতে জন্ম। স্কুলে পড়ার সময়ই প্রবাসী ও ভারতীতে কবিতা ছাপা হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তারী পাশ করেন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলিকাতায় বসবাস করেন। ছোট গল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য—সকল রচনাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক। উল্লেখযোগ্য রচনা 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'নির্মোক' ইত্যাদি। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, জগৎতারিণী পদক, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান হয়।